ভৌতজগৎ ও পরিমাপ

ভৌতজগৎ: আমাদের চারপাশের যা কিছু নিয়ে বস্তু জগৎ গঠিত তাকে ভৌত জগৎ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, বাস্তব প্রকৃতি এবং মহাবিশ্ব নিয়ে যে জগত গঠিত তাকে ভৌত জগৎ বলে। ভৌতজগৎ মূলত চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। যথা—

1. স্থান
2. কাল (সময়)
3. ভর
4. শক্তি

স্থান: একটি নির্দিষ্ট আকারের বস্তু যতটুকু জায়গা দখল করে তাকে ঐ বস্তুর স্থান বলে।

স্থানাঙ্ক ও স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা

স্থানাঙ্ক: বিন্দুর অবস্থান অঙ্কের সাহায্যে প্রকাশ করা হলে, ঐ অংকগুলিকে বিন্দুর স্থানাঙ্ক বলে।

স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা: স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে এক বা একাধিক সংখ্যা, অথবা স্থানাঙ্ক ব্যবহার করে ইউক্লিডীয় স্পেসে একটি বিন্দু অথবা অন্য জ্যামিতিক উপাদানের অনন্য অবস্থান নির্ণয় করা হয়। রেনে দেকার্তে সর্বপ্রথম স্থানাঙ্কের ধারণা দেন।

কাল: কোনো ঘটনা সংঘটনের সময়কে কাল বলে। আর সময় হচ্ছে পরিমাপক, যা ঘটে গেছে, যা ঘটছে, যা ঘটবে এই তিনটির ভেতরে পার্থক্য নিরূপনকারী পরিমাপই হচ্ছে সময়। অর্থাৎ, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে পার্থক্যকারীকে সময় বলা হয়।

ভর: কোনো বস্তুর মধ্যে যে পরিমাণ জড়পদার্থ থাকে তাকে বস্তুর ভর বলে। অন্যভাবে বলা যায়, ভর হলো কোন বস্তুর পদার্থের মোট পরিমাণ বা জড়তার পরিমাপ। কোনো বস্তুর শক্তি বাড়লে (যেমন গতিশক্তি বাড়লে) তার আপেক্ষিক ভরও বৃদ্ধি পায়। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী, ভর হলো এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা তার চারপাশের স্থান-কালকে (Spacetime) বাঁকিয়ে দেয়। এই বাঁকিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা বা মাত্রাই হলো ভরের পরিমাপ। অর্থাৎ ভর হলো শক্তির ঘনীভূত রূপ যা স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয়। কোয়ান্টাম তত্ত্বানুসারে ভর হলো হিগস ক্ষেত্রের সাথে কণিকার মিথস্ক্রিয়া বা সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তির বহিঃপ্রকাশ। কোনো কণিকা হিগস ক্ষেত্রের সাথে যত বেশি শক্তিশালীভাবে মিথস্ক্রিয়া করে, তার ভর তত বেশি হয়। সহজ কথায়, হিগস ক্ষেত্রের সাথে কণিকার 'ঘর্ষণ' বা বাধার ফলেই ভরের সৃষ্টি হয়। যে কণা হিগস ক্ষেত্রের সাথে কোনো মিথস্ক্রিয়া করে না (যেমন ফোটন বা আলো), তারা ভরহীন।

শক্তি: কোনো বস্তু বা উৎসের কাজ করার সামর্থকে শক্তি বলে। শক্তিকে মোটামুটি আট ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

1. যান্ত্রিক শক্তি (Mechanical Energy)
2. তাপশক্তি (Heat Energy)
3. শব্দ শক্তি (Sound Energy)
4. আলোক শক্তি (Light Energy)
5. চুম্বক শক্তি (Magnetic Energy)
6. বিদ্যুৎ শক্তি (Electrical Energy)
7. রাসায়নিক শক্তি (Chemical Energy)
8. পারমাণবিক শক্তি (Atomic Energy)

পরিমাপ: কোনো কিছুর পরিমান নির্ধারণ করাকে পরিমাপ বলে।

ভৌতজগতের পরিমাপ হলো পরম এবং পরিমাণবাচক। ভৌতবস্তু, মিথস্ক্রিয়া ও পরিবর্তন এই তিনটি বিষয়ের অধ্যয়ন নিয়ে পদার্থবিজ্ঞান।

ভৌতবস্তু ও ভৌতরাশি

ভৌতবস্তু: ত্রিমাত্রিক স্থানে একটি নির্দিষ্ট আবদ্ধ সীমানার মধ্যে পদার্থের সংকলনকেই সচরাচর বস্তু বা ভৌত বস্তু বলা হয়।

রাশি বা ভৌতরাশি: ভৌত (বাস্তব) জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাকে রাশি বলে। একে ভৌত রাশি বা প্রাকৃতিক রাশি নামেও অভিহিত করা হয়।

দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, উষ্ণতা, বেগ ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়। তাই এদের প্রত্যেককে একেকটি ভৌতরাশি বলে। কিন্তু পানি, কাঠ, বায়ু– ইত্যাদি পরিমাপ করা যায় না তবে, এদের ভর, ওজন, আয়তন ও ঘনত্ব পরিমাপযোগ্য। তাই পানি, কাঠ বায়ু ইত্যাদি ভৌতবস্তু হলেও এরা ভৌতরাশি নয়। আবার এদের ভর, ওজন, আয়তন ও ঘনত্ব ভৌতরাশি হলেও এরা ভৌতবস্তু নয়।

রাশির প্রকারভেদ

উৎপত্তিগত বা গঠনগত দিক থেকে রাশি দুই প্রকার। যথা—

1. মৌলিক রাশি
2. লব্ধ বা যৌগিক রাশি

মৌলিক রাশি: যে সকল রাশি স্বাধীন বা নিরপেক্ষ; যারা অন্য কোনো রাশির উপর নির্ভর করে না বরং অন্যান্য রাশিগুলো এদের উপর নির্ভর করে, তাদেরকে মৌলিক রাশি বলে। মৌলিক রাশি মোট সাতটি। যথা—

1. দৈর্ঘ্য
2. ভর
3. সময়
4. তাপমাত্রা
5. তড়িৎ প্রবাহ
6. দীপন তীব্রতা
7. পদার্থের পরিমাণ

১৯৬০ সালে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের যৌথ সম্মেলনে এ সাতটি রাশিকে মৌলিক রাশি হিসেবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

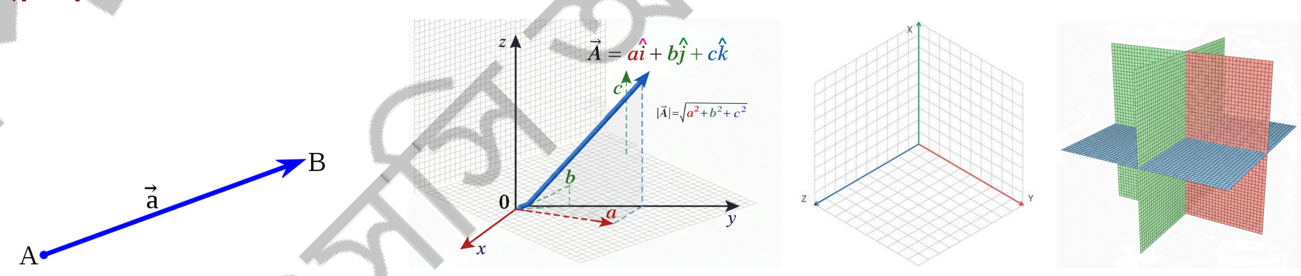
লব্ধ বা যৌগিক রাশি: যে সকল রাশি মৌলিক রাশির উপর নির্ভর করে তাদেরকে লব্ধ বা যৌগিক রাশি বলে।

মান ও দিকের উপর বিবেচনা করে রাশিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

1. স্কেলার রাশি বা অ-দিক রাশি
2. ভেক্টর রাশি বা দিক রাশি

স্কেলার রাশি বা অ-দিক রাশি: যে সকল ভৌত রাশিকে শুধু মান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, দিক নির্দেশনার প্রয়োজন হয় না তাদেরকে স্কেলার রাশি বা অ-দিক রাশি বলে।
ভেক্টর রাশি বা দিক রাশি বা সদিক রাশি: যে সকল ভৌত রাশিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য মান ও দিক উভয়েরই প্রয়োজন হয়, তাদেরকে ভেক্টর রাশি বা দিক রাশি বা সদিক রাশি বলে।

ভেক্টর রাশির উপস্থাপনা:



জ্যামিতিক পদ্ধতি ও কার্টেসিয়ান পদ্ধতি এবং কল্পিত ত্রিমাত্রিক স্থানাংক ব্যবস্থাদ্বয়

ভেক্টর রাশির উপস্থাপনার তিনটি প্রধান উপায়—
জ্যামিতিক পদ্ধতি: ভেক্টরকে একটি তীরযুক্ত সরলরেখা দিয়ে প্রকাশ করা হয়, যেখানে রেখার দৈর্ঘ্য ভেক্টরের মান দেখায় এবং তীরের দিক ভেক্টরের দিক নির্দেশ করে। সাধারণত ভেক্টর লেখা হয় $\overrightarrow{AB}$ আকারে, যেখানে A হলো আদিবিন্দু এবং B হলো প্রান্তবিন্দু। ভেক্টরের দৈর্ঘ্য বা মান দেখাতে পরম মানের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, যেমন $|\overrightarrow{AB}|$ কখনো কখনো শুধু AB লিখেও মান বোঝানো হয়।

অক্ষ সংযোজিত বা কার্টেসিয়ান পদ্ধতি: ভেক্টরকে নির্দিষ্ট অক্ষ বরাবর উপাংশে (components) বিভক্ত করে লেখা হয়। ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে একটি ভেক্টর $\vec{A} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$ আকারে প্রকাশ করা হয়, যেখানে $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ যথাক্রমে X, Y, Z অক্ষের একক ভেক্টর, আর *a, b, c* হলো সেই ভেক্টরের উপাংশ বা উপাদান, যা দেখায় ভেক্টরটি কতটা X, Y, Z অক্ষ বরাবর প্রসারিত। এই পদ্ধতি গাণিতিক বিশ্লেষণ ও হিসাবের জন্য সুবিধাজনক এবং ভেক্টরের মান নির্ণয় করা হয় $|\vec{A}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ সূত্রে।

চিহ্ন বা সিম্বলিক পদ্ধতি: ভেক্টরকে সাধারণত তার ভৌত অর্থ বা অক্ষের দিক নির্দেশ করে প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন বেগ ভেক্টরকে $\vec{v}$ এবং বল ভেক্টরকে $\vec{F}$ দ্বারা নির্দেশ করা হয়। এ ধরনের উপস্থাপনায় ভেক্টর বোঝাতে সাধারণত তীরচিহ্নযুক্ত প্রতীক, কার্সিভ বা বিশেষ গাণিতিক নোটেশন ব্যবহৃত হয়, যা ধারণাগত ব্যাখ্যায় বেশি ব্যবহৃত হয়।

মিথস্ক্রিয়া: যে প্রক্রিয়ায় একাধিক ভৌত বস্তু পরস্পরকে প্রভাবিত করে, তাকে মিথস্ক্রিয়া বলে। যেকোনো বস্তু মিথস্ক্রিয়া করে। মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট প্রভাব বলের মাধ্যমেই প্রকাশ ও পরিমাপ করা যায়, তাই বলকেই মিথস্ক্রিয়া বলা হয়। আধুনিক তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান অনুযায়ী মহাবিশ্বে চারটি পৃথক মৌলিক মিথস্ক্রিয়া ক্রিয়াশীল। এরা হলো: মহাকর্ষ বল, দূর্বল মিথস্ক্রিয়া, তাড়িতচৌম্বক মিথস্ক্রিয়া ও শক্তিশালী মিথস্ক্রিয়া।

পরিবর্তন: পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় পরিবর্তন বলতে পদার্থ বা শক্তির এক রূপ থেকে ভিন্ন কোনো রূপে রূপান্তরিত হওয়া কে বুঝায়। পদার্থের পরিবর্তন প্রধানত দুই প্রকার। যথা—

1. ভৌত পরিবর্তন
2. রাসায়নিক পরিবর্তন।

ভৌত পরিবর্তন: যার ফলে কোনো পদার্থের অভ্যন্তরীণ রাসায়নিক গঠনের কোনো পরিবর্তন না ঘটে, শুধু বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তাকে ভৌত পরিবর্তন বলে।

উদাহরণ— বরফের গলন একটি ভৌত পরিবর্তনের উদাহরণ। কারণ বরফ গলে পানি তৈরি হয়। পানির আকার বা আকৃতি বরফ থেকে ভিন্ন, কিন্তু এক্ষেত্রে নতুন কোনো পদার্থের সৃষ্টি হয় না। পানিকে 0°C তাপমাত্রায় ঠান্ডা করা হলে আবার পূর্বের বরফ পাওয়া যায়।

রাসায়নিক পরিবর্তন: যে পরিবর্তনের ফলে কোন পদার্থের অণুসমূহের উপাদান ও অণুর গঠন প্রকৃতির স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে এবং সেই পদার্থ নিজের ধর্ম হারিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্মবিশিষ্ট অন্য পদার্থে পরিবর্তিত হয়, তাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে। প্রতিটি রাসায়নিক বিক্রিয়াতেই রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সকল রাসায়নিক পরিবর্তনে তাপশক্তির পরিবর্তন ঘটে। যখন কোন রাসায়নিক পরিবর্তন বা বিক্রিয়া সম্পন্ন হবে তাতে তাপশক্তি শোষিত হবে, না হয় শক্তি বর্জিত হবে।

উদাহরণ— প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ালে কার্বন ডাই অক্সাইড, পানি ও তাপ উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O$ + তাপ

মহাবিশ্ব ও এর সৃষ্টিতত্ব

মহাবিশ্ব বা মহাজগৎ: সকল গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, ধূমকেতু, ব্ল্যাক হোল সহ সমস্ত মহাজাগতিক বস্তুকে একত্রে মহাবিশ্ব বলে। এমনকি সমস্ত মহাজাগতিক বস্তু যে অসীম শূন্যস্থানে বিরাজ করছে তা-ও মহাবিশ্বের অংশ। তবে শুধু এই অসীম সংখ্যক মহাজাগতিক বস্তু বা মহাশূন্যই নয়, সময়ও মহাবিশ্বের একটি অপরিহার্য অংশ। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে যে, সকল মহাজাগতিক বস্তু বা শক্তি, মহাশূন্য ও সময়ের যে সমষ্টি বিবেচনা করা করা হয় তা-ই মহাবিশ্ব।

মহাবিশ্ব সৃষ্টি তত্ব: বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের মধ্যে মহাবিশ্বের সৃষ্টি তত্ব আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের জন্য ছিল এক লম্বা ভ্রমণ। প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের অসংখ্য মতবাদ রয়ে গেছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য নিয়ে। মহাবিশ্বের সৃষ্টি ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন সময় নানান তত্বের ধারণা দিয়েছেন। আদিকাল থেকেই মানুষ মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে নানা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে, এখনো তবু মহাবিশ্ব ও এর সৃষ্টি রহস্যের অনেক কিছুই মানুষের অজানা।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত তার মধ্যে নিচের কয়েকটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

- অবিচল অবস্থা (Steady state theory)
- স্পন্দনশীল তত্ব (Pulsating theory)
- সম্প্রসারণ তত্ব (Expanding universe theory)
- মহাবিস্ফোরন তত্ব (Big-bang theory)

অবিচল অবস্থা তত্ব: এই তত্বের প্রবর্তক হলেন জ্যোতিনী পোল্ড, বন্ড ও ফ্রেড হোয়েল। এই তত্বের মতে মহাবিশ্ব একটি অবিচল বা স্থির অবস্থায় পৌছে গেছে এবং সকল স্থান থেকে সকলের নিকট একই রকম দেখায়। মহাবিশ্বের মোট গ্যালাক্সির সংখ্যাও একটি স্থির অবস্থায় পৌঁছেছে। মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষণ যোগ্য অংশ থেকে যদিও কিছু গ্যালাক্সি হারিয়ে যাচ্ছে, নতুন গ্যালাক্সি তৈরি হয়ে গ্যালাক্সির সংখ্যা সমান করছে। অবিচল অবস্থা তত্ব, যাকে অবিরত তৈরি তত্বও বলা হয়। এর ভিত্তি হলো পদার্থ ও শক্তির আন্তঃরূপান্তর।

স্পন্দনশীল তত্ব: এই তত্বের মতে মহাবিশ্ব অনির্দিষ্টভাবে প্রসারিত হতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট অবস্থার পর মহাকর্ষীয় আকর্ষণের কারণে এই প্রসারণ থেমে যাবে এবং মহাবিশ্ব পুনরায় সঙ্কুচিত হয়ে আসবে। সঙ্কুচিত হয়ে মহাবিশ্ব একটি সংকট আকারে পৌঁছালে এটা পুনরায় বিস্ফোরিত হবে এবং নতুন করে প্রসারণ ও তারকার সঙ্কোচন ঘটবে। ফলে মহাবিশ্বের সীমা একবার বড় ও একবার ছোট হয়ে অর্থাৎ সীমানা স্পন্দিত হবে, এজন্য কখনো কখনো একে স্পন্দনশীল মহাবিশ্ব বলা হয়।

সম্প্রসারণ তত্ব: এই তত্ব মতে সকল গ্যালাক্সি পৃথিবী থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে এবং আমরা একটি শূন্য বা খালি মহাবিশ্ব পাব। এর কারণ হলো মহাবিশ্বের ধারাবাহিক বা অবিরত প্রসারণের ফলে অনেক অনেক গ্যালাক্সি মহাবিশ্বের সীমানার বাইরে চলে যাবে এবং হারিয়ে যাবে।

মহাবিস্ফোরণ তত্ব: মহাবিশ্ব ও পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচলিত তত্ত্বের মধ্যে শুদ্ধতার দিক থেকে সবচেয়ে প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য তত্ব টি হল “মহাবিস্ফোরণ তত্ব” বা "বিগ ব্যাং" থিওরি।

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে বেলজিয়ামের পদার্থ বিজ্ঞানী জর্জ লেমিটর প্রথম বিগব্যাং তত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ব অনুসারে, কোটি কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের সবকিছুই একটি অতি উষ্ণ এবং অতিক্ষুদ্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত ছিল। এর ঘনত্ব এতটাই বেশি ছিল যে মহাজগতের সকল কণা ও শক্তি এই ক্ষুদ্র বিন্দুতে আবদ্ধ ছিল। অধিক ঘনত্ব, ভর ও তাপমাত্রার কারণে, এটি প্রবলভাবে বিস্ফোরিত হয় এবং প্রচণ্ড বেগে চারদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকে। মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের বিষয়টি বিগ ব্যাং বা মহা বিস্ফোরণ তত্ব নামে পরিচিত; যা মুসলিমদের ধর্মীয় গ্রন্থ পবিত্র কুরআনুল কারীম এর (২১:৩০, ৪১:১১, ৫১:৪৭) আয়াতগুলো থেকে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে কুরআনুল কারীমের একটি আয়াতে বলা হয়েছে, "পৃথিবীসহ মহাবিশ্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল একটি অতিশক্ত ঘনিভূত ও গলানো উপাদানে এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত সন্নিবিষ্ট ছিল পিণ্ডাকৃতিতে, অতঃপর আমি উহাকে খণ্ডায়িত করেছি এক বিস্ফোরনের দ্বারা।" কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণের বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ”আর আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আসমানকে সৃষ্টি করেছি আর আমি অবশ্যই নিয়মিতভাবে তা প্রসারিত করছি।”

মহাবিস্ফোরণের ছয়টি ধাপ: বিগ ব্যাং বা মহা বিস্ফোরণ তত্বানুসারে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে ছয়টি ধাপে। উল্লেখ্য, মুসলিমদের পবিত্র ধর্মীয়গ্রন্থ কুরআনুল কারীমের (২৫:৫৯) নং নুসুসে বলা হয়েছে, "তিনিই (আল্লাহ) নভোমণ্ডল ও ভূমন্ডল এবং এতদুভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করেছেন ছয়টি সময়কালে অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন।"

বিগ ব্যাং তত্বানুসারে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ছয়টি ধাপ যথাক্রমে—

1. মহাবিস্ফোরণ (Big bang)
2. স্ফীতি (Cosmic Inflation)
3. উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বস্তুকণার প্রতিক্রিয়া (High energy particle reaction)
4. পরমাণুর গঠন (First formation of nuclei)
5. অণুর গঠন (First formation of atom)
6. ছায়াপথ ও নক্ষত্রসমুহের আবির্ভাব (First formation of galaxies & stars)

মহাবিস্ফোরণ (Big bang): আজ থেকে সাড়ে তের বিলিয়ন বছর পূর্বে বিগ ব্যাং নামের একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের সূচনা হয়। এই বিস্ফোরণের পূর্বে এই মহাবিশ্বের সবকিছু একটি ক্ষুদ্র বিন্দুতে আবদ্ধ ছিলো। বিস্ফোরণ পূর্ববর্তী এই ক্ষুদ্র বিন্দুকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় সিঙ্গুলারিটি (Singularity) এবং এটি আকারে একটি পরমাণুর মতোই ছিলো। এই ক্ষুদ্র বিন্দুতেই আবদ্ধ ছিলো মহাবিশ্বের সমস্ত শক্তি, তাপ ও চাপ। এই বিন্দুর বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সূচনা হয়।

স্ফীতি (Cosmic Inflation): বিস্ফোরণের মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে কল্পনাতীত দ্রুতগতিতে মহাবিশ্বের একটি বিশাল স্ফীতি হয়ে যায়। যার বিস্তৃতি ছিলো শূন্য থেকে দুই বিলিয়ন কিলোমিটার। এত অল্প সময়ে এই স্ফীতির গতি ছিলো আলোর গতির (3×10^8 ms^{-1}) চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। মহাস্ফীতির এই শর্ট পিরিয়ড কে বলা হয় Cosmic Inflation। বিস্ফোরণ পরবর্তী এই স্ফীত গোলককে বলা হয় আদি অগ্নিগোলক (Primordlal fire ball)। শুন্য থেকে দুই বিলিয়ন কিলোমিটার মহাবিশ্বের স্ফীতির এই পুরো ব্যাপারটি ছিলো মাত্র এক সেকেন্ড সময়ের! আর ছয় সময়কালের এই এক সেকেন্ড টি একটি কাল। আর এই কালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, সেকেন্ডের ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ভাগের প্রত্যেক ভাগ সময়ে এই মহাবিশ্বের অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক ইভেন্ট সংঘটিত হয়েছে। বিশেষ করে তাপমাত্রা দ্রুত পরিবর্তন। এই প্রত্যেকটি সংঘটিত ইভেন্ট গুলো আজকের মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থার ক্ষেত্রে অত্যান্ত গুরত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য ভূমিকা রেখেছে।

উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বস্তুকণার প্রতিক্রিয়া (High energy particle reaction): বিগ ব্যাং বিস্ফোরণের এক সেকেন্ড পরের সময় থেকে তিন মিনিট সময় পর্যন্ত বলা হয় লেপটন কাল। এই সময়ের মধ্যে মহাবিশ্বের মূল বস্তুকণা যেমন, কোয়ার্ক, ইলেকট্রন, ফোটন, নিউট্রন ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। এরপর মহাবিশ্ব ক্রমশ ঠান্ডা হতে থাকে এবং প্রকৃতির মৌলিক বলসমূহের সৃষ্টি হয়। এরপর তিন মিনিট থেকে বিশ মিনিট সময়কে নিউক্লিয় সংশ্লেষণের কাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তখন মহাবিশ্বের তাপমাত্রা একশত কোটি কেলভিনে নেমে আসে। প্রোটন, নিউট্রন মিলিত হয়ে সরল প্রাথমিক মৌল যেমন, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়ামের নিউক্লিয়াস গঠন করে। আর প্রকৃতপক্ষে বিগ ব্যাং এর তিন মিনিট পর হতে পরবর্তী দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বছর পর্যন্ত সময়কালকে বিকিরণের আধিপত্যের কাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তখন মহাজগতে শক্তির চেয়ে বস্তুর পরিমাণ বেশি ছিলো।

পরমাণুর গঠন (First formation of nuclei): এরপর দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বছর থেকে ত্রিশ লক্ষ বছর পর্যন্ত সময় কে বলা হয় পুনঃসংযোগের যুগ। এসময় তাপমাত্রা তিন হাজার কেলভিনে নেমে আসে। ঘনত্ব কমে আসে এবং আয়নিত হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস ইলেকট্রন কে আকর্ষণ করতে থাকলে পুরো মহাবিশ্বে এ প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে পরমাণুর গঠন শুরু হয়। পরমাণু যখন ইলেকট্রন কে ধারণ করে তখন তারা তড়িৎ নিরপেক্ষ হয়ে যায়। এবং পুরো মহাবিশ্ব চূড়ান্ত ভাবে আলোক স্বচ্ছতা লাভ করে।

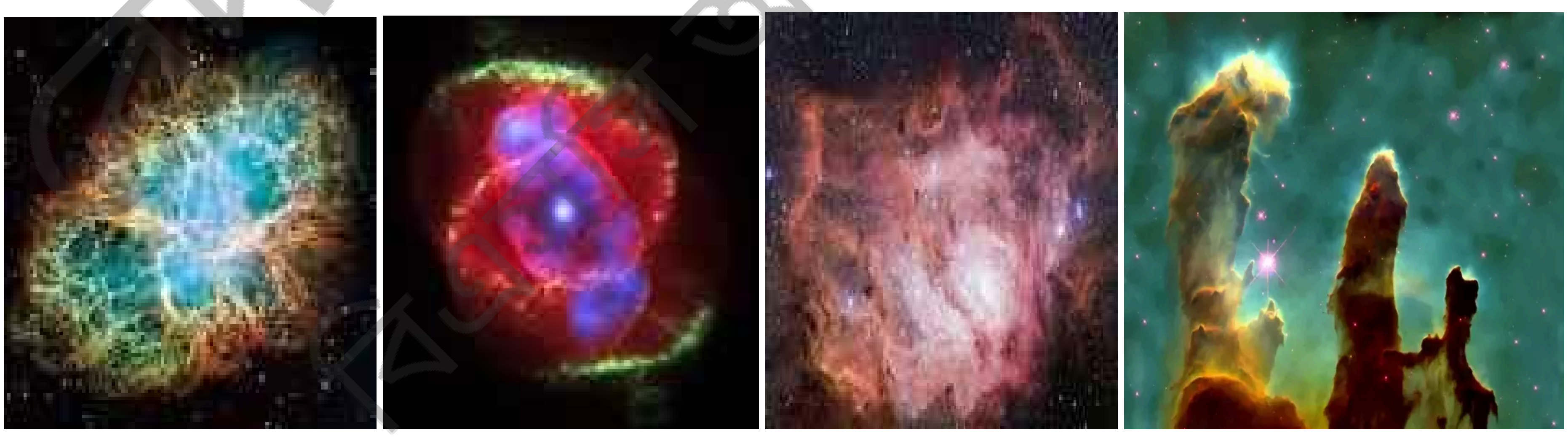
অণুর গঠন (First formation of atom): পুরো মহাবিশ্ব আলোক স্বচ্ছতা লাভ করার সাথে সাথে পরমাণু গুলোর মধ্যে পদার্থের মূল ভিত্তি অণুর গঠন হতে থাকে। এবং এর দ্বারা পদার্থের সৃষ্টি হয়। বিগ ব্যাং বিস্ফোরণ থেকে এ পর্যন্ত ত্রিশ লক্ষ বছর সময় চলে গেছে। মহাবিশ্ব ফোটন দ্বারা আলোক স্বচ্ছতা লাভ করলেও তখনও পর্যন্ত মহাবিশ্ব আলোকিত হতে পারে নি। কারণ তখনও পর্যন্ত কোনো তারকা গঠিত হয় নি। ফলে বয়সে ত্রিশ লক্ষ বছর হতে পনেরো কোটি বছর পর্যন্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে আমাদের এ মহাবিশ্ব। এবং এই সময়কে Dark matter বা অদৃশ্য বস্তু মহাবিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করে। তাই এই সময়টা মহাবিশ্বের অন্ধকার যুগ।

ছায়াপথ ও নক্ষত্রসমূহের আবির্ভাব (First formation of galaxies & stars): পনেরো কোটি বছর থেকে শুরু করে একশত কোটি বছর পর্যন্ত মহাবিশ্বে কোয়েসার তৈরী হয়। কোয়েসার হল আপাত নাক্ষত্রিক রেডিও উৎস (Quasi Stellar Radio Source)। এরা তীব্র বিকিরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বকে পুনরায় আয়নিত করে বলে, একে পুনঃআয়নায়নের কাল হিসেবে ধরা হয়। তখন মহাবিশ্ব আয়নিত প্লাজমা দ্বারা পূর্ণ হয়। এই তিনশত কোটি বছরের মধ্যে তৈরী হয় ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি এবং এর মধ্যে আবার তৈরী হয় নক্ষত্র। ছয়শত কোটি বছরের মধ্যে ছায়াপথে দানবাকৃতির সব নক্ষত্র সমূহ বিস্ফোরণের মাধ্যমে তৈরী হয় ব্লাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর বা কৃষ্ণবিবর। নক্ষত্র সমূহের সুপারনোভা বিস্ফোরণ মাধ্যমে তৈরী হয় ভারী মৌলসমূহ তথা নিকেল, গোল্ড, সিলভার ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ে মহাবিশ্বে। বিগ ব্যাং এর প্রায় আটশত কোটি বছর পর আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির একটি বাহু যার নাম ওরিয়ন (Orion cygnus arm)। সেই ওরিয়ন বাহুতে আমাদের সূর্য বা সৌরজগতের সৃষ্টি হয়। এবং তার নয়শত বিশ কোটি বছরের পর সৃষ্টি হয় আমাদের পৃথিবী। আর এভাবেই একটি পরমাণু আকারের বিন্দু থেকে বিগ ব্যাং বিস্ফোরনের মাধ্যমে ছয়টি সময়কালে আল্লাহ এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। যে বিন্দুতে মিশে ছিলো এই মহাবিশ্বের সব বস্তু তথা সব আসমান, জমিন ও পৃথিবী। মুসলিমদের ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআনের (২১:৩০) নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "অবিশ্বাসীরা কি দেখে না! আসমান ও জমিন ওতোপ্রোতভাবে (একটি বিন্দুতে) মিশে ছিলো, অতপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম। আর জীবন্ত সবকিছুকে সৃষ্টি করলাম পানি থেকে, এরপরও কি তারা ঈমান আনবে না?"

নক্ষত্রের উৎপত্তি

নীহারিকা বা মহাজাগতিক মেঘের অস্তিত্ব: মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ ধূলিকণা ও গ্যাস ছড়িয়ে আছে, যেগুলোকে নীহারিকা (nebula) বলা হয়। এই নীহারিকাগুলো মূলত হাইড্রোজেন গ্যাস ও প্লাজমা দ্বারা গঠিত আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘ। আকারে অত্যন্ত বিস্তৃত হলেও এদের ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে কম। তবুও নক্ষত্র সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদান এই নীহারিকাগুলোর মধ্যেই বিদ্যমান। বাস্তবে প্রায় সব নক্ষত্রের জন্মই এই ধরনের মহাজাগতিক মেঘের ভেতর থেকে ঘটে।

মহাকর্ষের প্রভাবে মেঘের সংকোচন শুরু: নীহারিকার ভেতরে থাকা বিপুল পরিমাণ গ্যাস ও ধূলিকণার উপর মহাকর্ষ বল ক্রিয়া করতে থাকে। এই মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ফলে কণাগুলো ধীরে ধীরে একে অপরের দিকে এগিয়ে আসে এবং মেঘটি ক্রমশ জড় হতে শুরু করে। কণাগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব কমার সঙ্গে সঙ্গে মহাকর্ষের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। এর ফলস্বরূপ সম্পূর্ণ হাইড্রোজেন মেঘটি সংকুচিত হতে থাকে এবং বিশেষ করে এর কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ঘনত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।



মহাজাগতিক মেঘ

ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে চাপ ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি: মেঘের সংকোচনের সাথে সাথে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থানে চলে আসে এবং পরস্পরের সাথে ঘন ঘন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয়। একই সঙ্গে মেঘের অভ্যন্তরে গ্যাসের চাপও বৃদ্ধি পায়। যদিও এই চাপ মহাকর্ষ বলের বিপরীত দিকে কাজ করে, তবুও প্রাথমিক পর্যায়ে মহাকর্ষই প্রাধান্য বিস্তার করে। ফলে মেঘটি আরও বেশি উত্তপ্ত ও ঘন হয়ে ওঠে।

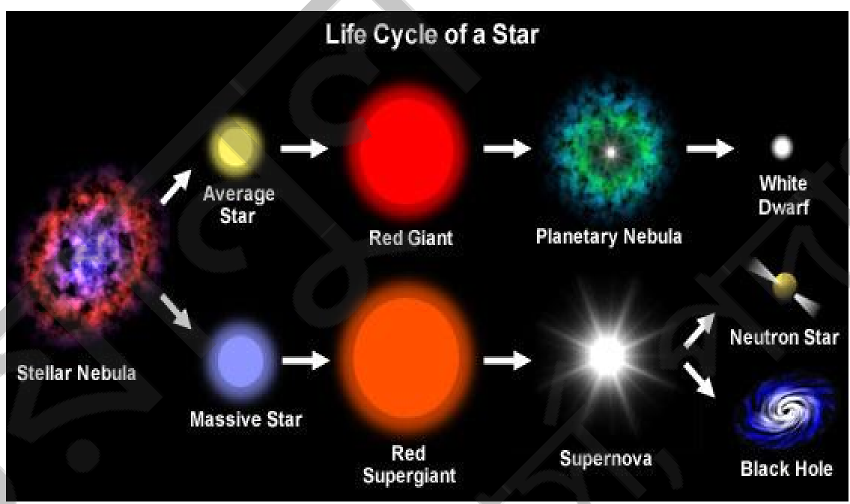
উচ্চ তাপমাত্রায় প্রোটন–প্রোটন বিক্রিয়ার সূচনা: হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে একটি মাত্র প্রোটন থাকে, যা ধনাত্মক চার্জযুক্ত। সাধারণ অবস্থায় দুটি প্রোটন একে অপরকে বৈদ্যুতিক বিকর্ষণের কারণে দূরে ঠেলে দেয়। কিন্তু যখন মেঘের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা প্রায় এক কোটি কেলভিনে পৌঁছে যায়, তখন প্রোটনগুলো অত্যন্ত উচ্চ গতিতে চলাচল করে। এই অবস্থায় শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বল তাদের বৈদ্যুতিক বিকর্ষণকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং দুটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস কাছাকাছি এসে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ায় অংশ নেয়।

ডিউটেরিয়াম সৃষ্টির প্রক্রিয়া: নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ার প্রথম ধাপে দুটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস মিলিত হয়ে একটি ডিউটেরিয়াম নিউক্লিয়াস গঠন করে। ডিউটেরিয়াম হলো হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ, যার নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন বিদ্যমান। এই প্রক্রিয়ায় একটি পজিট্রন এবং একটি ইলেক্ট্রন নিউট্রিনো উৎপন্ন হয়, যা নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে যায়। শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বল প্রোটন ও নিউট্রনকে একত্রে আবদ্ধ করে রাখে।

হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি ও শক্তি নির্গমন: ডিউটেরিয়াম নিউক্লিয়াসের সাথে আরও একটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস যুক্ত হলে একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি হয়, যেখানে দুটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন থাকে। এই ফিউশন বিক্রিয়ার ফলে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন শক্তি তাপ ও আলোকশক্তি হিসেবে নক্ষত্রের কেন্দ্র থেকে বাইরে নির্গত হতে থাকে। এর ফলে কেন্দ্রীয় অঞ্চল আরও উত্তপ্ত হয় এবং ফিউশন বিক্রিয়া অধিক কার্যকরভাবে চলতে থাকে।

শক্তির ভারসাম্য ও নক্ষত্রের জন্ম: নিউক্লিয়ার ফিউশন থেকে উৎপন্ন শক্তি নক্ষত্রের ভেতরের দিকে মহাকর্ষজনিত সংকোচনের বিপরীতে চাপ সৃষ্টি করে। একসময় এই অভ্যন্তরীণ শক্তিচাপ এবং বাহ্যিক মহাকর্ষ বলের মধ্যে একটি স্থিতিশীল ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে একটি উজ্জ্বল, উত্তপ্ত ও স্থায়ী গোলক গঠিত হয়, যা নিরবচ্ছিন্নভাবে আলো ও তাপ বিকিরণ করতে থাকে। এভাবেই একটি হাইড্রোজেন মেঘ থেকে জন্ম নেয় একটি পূর্ণাঙ্গ নক্ষত্র।

নক্ষত্রের জীবনচক্র



নক্ষত্রের জীবনচক্র

অভিকর্ষ ও শক্তিচাপের সাম্যাবস্থায় নক্ষত্রের স্থিতিশীল জীবন: একটি নক্ষত্র তার জীবন শুরু করে এবং দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকে অন্তর্মুখী অভিকর্ষ বল ও বহির্মুখী শক্তিচাপের সাম্যাবস্থার মাধ্যমে। নক্ষত্রের নিজস্ব ভরের কারণে অভিকর্ষ বল তার সমস্ত পদার্থকে কেন্দ্রের দিকে টেনে আনে। অপরদিকে, নক্ষত্রের কেন্দ্রে চলমান নিউক্লিয়ার ফিউশন প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরির সময় বিপুল শক্তি উৎপন্ন হয়, যা বাইরে দিকে চাপ প্রয়োগ করে। যতদিন এই দুই বিপরীতমুখী বলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে, ততদিন নক্ষত্র স্থিতিশীলভাবে আলো ও তাপ বিকিরণ করতে থাকে।

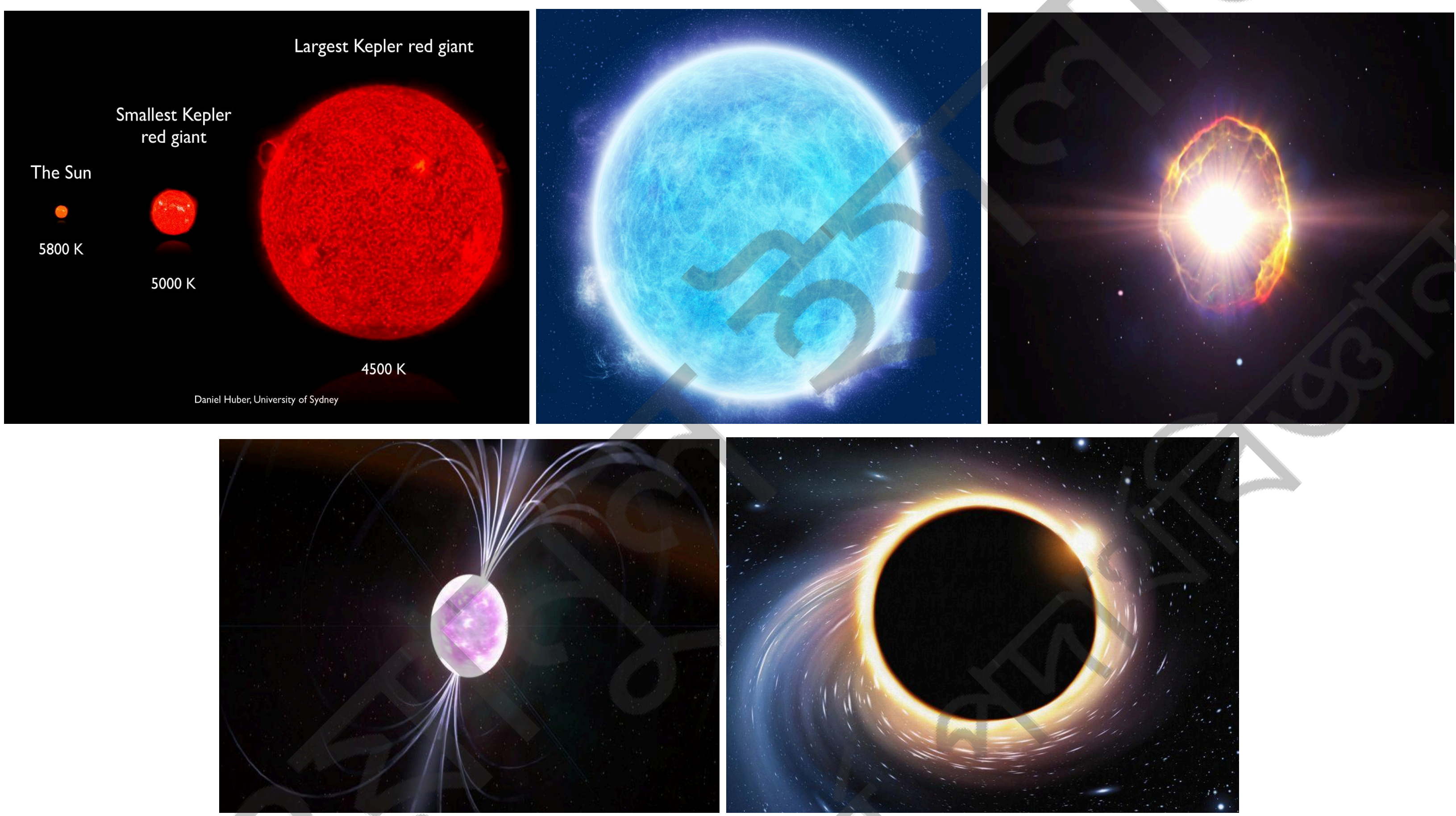
হাইড্রোজেন জ্বালানি নিঃশেষ হওয়ার সূচনা: দীর্ঘ সময় ধরে ফিউশন চলতে থাকলে নক্ষত্রের কেন্দ্রে থাকা হাইড্রোজেন ধীরে ধীরে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এক পর্যায়ে কেন্দ্রে হাইড্রোজেনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এর ফলে নিউক্লিয়ার ফিউশনের হার হ্রাস পায় এবং বহির্মুখী শক্তিচাপ দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন অভিকর্ষ বল তুলনামূলকভাবে প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করে।

কেন্দ্রীয় সংকোচন ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির ধাপ: শক্তিচাপ কমে যাওয়ার ফলে নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় অঞ্চল সংকুচিত হতে থাকে। এই সংকোচনের কারণে কেন্দ্রে চাপ ও তাপমাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবে আবার নতুন ধরণের ফিউশন বিক্রিয়া শুরু হওয়ার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এর ফলেই নক্ষত্রের জীবনচক্র একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে।

ধাপে ধাপে ভারী মৌল গঠনের প্রক্রিয়া: নক্ষত্রের কেন্দ্রে ক্রমবর্ধমান তাপ ও চাপের কারণে প্রথমে হিলিয়াম থেকে কার্বন, এরপর অক্সিজেন, নিয়ন, সিলিকন ইত্যাদি মৌল তৈরি হতে থাকে। এই প্রক্রিয়া চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত লোহা (Fe) মৌল গঠিত হয়। এই ধাপে নক্ষত্রের কেন্দ্র একটি স্তরবিন্যাসযুক্ত কাঠামো ধারণ করে, যেখানে বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন মৌলের ফিউশন ঘটে।

লোহা (Fe) গঠনের পর শক্তি উৎপাদনের সমাপ্তি: লোহার প্রতি নিউক্লিয়নের বন্ধন শক্তি সর্বোচ্চ হওয়ায় এর নিউক্লিয়াস সবচেয়ে স্থিতিশীল। ফলে, লোহার নিউক্লিয়ার ফিউশন থেকে আর শক্তি উৎপন্ন হয় না; বরং শক্তি শোষিত হয়। ফলে লোহা তৈরি হওয়ার পর নক্ষত্রের কেন্দ্রে আর কার্যকর কোনো শক্তির উৎস অবশিষ্ট থাকে না। এর ফলে বহির্মুখী শক্তিচাপ প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং অভিকর্ষ বল সর্বশক্তিশালী হয়ে ওঠে।

কেন্দ্রীয় ধস ও সুপারনোভা বিস্ফোরণ: লোহা (Fe) গঠনের কারণে বহির্মুখী চাপ কমে যাওয়ায় প্রবল অভিকর্ষীয় চাপে ইলেকট্রন ও প্রোটন মিলে নিউট্রনে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে একটি অতি ঘন নিউট্রন-পিণ্ড গঠিত হয়, যা 'নিউট্রনাইজেশন' নামে পরিচিত। এই চরম ঘনত্বের কারণে সংকোচন বাধাগ্রস্ত হলে নক্ষত্রের বহিঃস্তরগুলো কেন্দ্রের ওপর প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ে ফলে বাইরের স্তরগুলো প্রতিফলিত হয়ে দিক পরিবর্তন করে বিপুল বেগে মহাশূন্যে ছিটকে যায়, আর এই আকস্মিক ও প্রচণ্ড বহিঃনিক্ষেপ ঘটনাই সুপারনোভা বিস্ফোরণ হিসেবে প্রকাশ পায়— যা মহাবিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ও দর্শনীয় প্রাকৃতিক বিস্ফোরণ। সুপারনোভা বিস্ফোরণের সময় লোহার মতো ভারী মৌল মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে, যা ভবিষ্যতে গ্রহ ও জীবনের উপাদান গঠনে সহায়তা করে। এই প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াতটি তাৎপর্যপূর্ণ— "...আর আমি (আকাশ থেকে) নাযিল করেছি লোহা, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং মানুষের জন্য বহু কল্যাণ...।" (৫৭:২৫)।



রেড জায়ান্ট বা লোহিত দানব, শ্বেত বামন, সুপারনোভা বিস্ফোরণ, নিউট্রন স্টার ও ব্লাক হোল

নক্ষত্রের শেষ পরিণতি; ভরের উপর নির্ভরশীলতা: নক্ষত্রের শেষ পরিণতি নির্ভর করে তার প্রাথমিক ভরের উপর। সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর—

- যদি নক্ষত্রের ভর সূর্যের তুলনায় কম বা কাছাকাছি হয়, তবে কেন্দ্রে অবশিষ্ট অংশটি শ্বেত বামন (White Dwarf) হিসেবে রয়ে যায়।
- যদি ভর সূর্যের প্রায় ১০ থেকে ২৯ গুণ হয়, তবে কেন্দ্রে অবশিষ্ট অংশটি অত্যন্ত ঘন হয়ে নিউট্রন নক্ষত্র (Neutron Star) তৈরি করে, যেখানে প্রোটন ও ইলেকট্রন মিলিত হয়ে নিউট্রনে পরিণত হয়েছে। এই ধরনের নক্ষত্রের আকার ছোট হলেও ভর বিশাল হয়। কিছু নিউট্রন নক্ষত্র দ্রুত ঘূর্ণন করে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর রেডিও বা এক্স-রে রশ্মি পাঠায়; এদেরকে বলা হয় পালসার। তাই প্রতিটি পালসারই একটি নিউট্রন নক্ষত্র হলেও সব নিউট্রন নক্ষত্র পালসার নয়।
- কিন্তু যদি নক্ষত্রের ভর অত্যন্ত বেশি হয়, অর্থাৎ সূর্যের তুলনায় অনেক বেশি, তাহলে কেন্দ্রে থাকা বস্তুটি এমনভাবে সংকুচিত হয় যে অভিকর্ষ বলকে আর কোনো বাহ্যিক শক্তি প্রতিরোধ করতে পারে না। এমন এক অবস্থায় নক্ষত্রের কেন্দ্র অসীমভাবে ঘন হয়ে যায় এবং আলোও বের হতে পারে না। এই চরম ঘন কেন্দ্রে গঠিত বস্তুকে বলা হয় ব্ল্যাক হোল (Black Hole)। ব্ল্যাক হোল হলো নক্ষত্রের একটি অবশেষ, যার শক্তিশালী অভিকর্ষ আশেপাশের স্থান-কালকে এমনভাবে বাঁকিয়ে ফেলে, যা মহাবিশ্বে এক রহস্যময় শক্তির কেন্দ্র তৈরী করে।

অর্থাৎ নক্ষত্রের জীবনচক্রের চূড়ান্ত পরিণতি নির্ভর করে তার ভরের ওপর। নক্ষত্রের জন্ম, জীবন এবং মৃত্যুর বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহ— (৫৬:৭৫), (৮১:১৫), (৮১:১৬), (৭৭:০৮), (৫৩:০১), (৮১:০২), (৮৬:০১-০৩) গভীর তাৎপর্য বহন করে, যার অনেক রহস্য আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান আজ উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে।

আকারের বিবেচনায় মহাজগতের প্রকারভেদ:

আকারের বিবেচনায় মহাজগৎ তিন প্রকার। যথা— মাইক্রোজগত, ম্যাক্রোজগত ও কসমিক জগত।

মাইক্রোজগৎ: কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর সাহায্যে যে জগতের আলোচনা করা হয় তাকে মাইক্রোজগৎ বলে।
ম্যাক্রোজগৎ: নিউটনীয় বা অনিউটনীয় বলবিদ্যা এবং তড়িৎ চৌম্বক তত্ত্বের সাহায্যে যে জগতের আলোচনা করা হয় তাকে ম্যাক্রোজগৎ বলে।
কসমিক জগৎ: আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সাহায্যে যে জগতের আলোচনা করা হয় তাকে কসমিক জগৎ বলে।

সিমিউলেশন তত্ত্ব

২০০৩ সালে দার্শনিক নিক বোস্ট্রম তার বিখ্যাত 'সিমিউলেশন তত্ত্ব' প্রবর্তন করেছিলেন। এটি তাত্ত্বিক হাইপোথিসিস যা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্য কিছু মতবাদের মধ্যে একটি। কম্পিউটার সিমিউলেশন হলো এমন এক ধরনের প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার যেখানে কোডের মাধ্যমে এমন বিশ্ব তৈরী করা সম্ভব যেটা সত্য বলে মনে হবে। এ তত্ত্বানুসারে মহাবিশ্ব একটি কম্পিউটার সিমিউলেশন করা প্রোগ্রাম বা হলোগ্রাফ। অর্থাৎ আমাদের মহাবিশ্ব ও এতে যা কিছু আছে তার কোনো কিছুই বাস্তব নয় বরং এটি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের জগতের মতো যা একটি সফটওয়্যার। এই সফটওয়্যার উন্নত সভ্যতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় যার একজন প্রোগ্রামার বা স্রষ্টা আছেন, যিনি পদার্থ গুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বা আচরণ কোডিংয়ের মাধ্যমে সেট করে রেখেছেন। আর পদার্থের এই ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বা আচরণগুলো নির্দিষ্ট প্যাটার্ন বা সূত্র মেনে চলে। বস্তুজগতের মতো প্রাণীজগত তথা আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের অনুভূতি, বোধশক্তি, কল্পনা শক্তি, কার্যক্ষমতা ইত্যাদি কোডিংয়ের মাধ্যমে সেট করা হয়েছে যার নির্দিষ্ট সীমা আছে। এই সীমার মধ্যে আমাদের ইচ্ছাশক্তি বা কর্মক্ষমতা তথা স্বকমান্ডিং প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানী এডুয়ার্ড ফ্রেডকিন তার একটি হাইপোথিসিসে বলেন যে মহাবিশ্ব নামক এই সফটওয়্যারের স্রষ্টা বা অতিজাগতিক শক্তি ভিন্ন ইউনিভার্সের কোথাও অবস্থান করে একে নিয়ন্ত্রণ করেন। হতে পারে এই মহাবিশ্ব গেমের একটি মিশনের মতো যা শেষ করে আমরা অন্য একটি মিশন তথা অন্যকোনো মহাবিশ্বে গমন করবো যেখানে পূর্বের মিশনের ফলাফল দৃশ্যমান হবে।

পদার্থ ও পদার্থবিজ্ঞান

পদার্থ

যার ভর এবং আয়তন আছে; ফলে স্থান দখল করে, যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায় এবং বল প্রয়োগে কিছু না কিছু প্রতিরোধ সৃষ্টি করে তাকে 'পদার্থ' বলে। চিরায়ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যা কিছু কোনও স্থান বা আয়তন দখল করে এবং জড়তা ও মহাকর্ষ ধর্ম প্রদর্শন করে, তাকে 'পদার্থ' বলে। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে, পদার্থকে বিপুল সংখ্যক অণু ও পরমাণুর সমষ্টি হিসেবে কল্পনা করা হয়। আর এসকল নিয়ে যে বিজ্ঞান রচিত হয় সেটাই পদার্থবিজ্ঞান।

গঠনভেদে পদার্থের প্রকারভেদ: গঠন অনুসারে পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

1. মৌলিক পদার্থ
2. যৌগিক পদার্থ

মৌলিক পদার্থ: যে বিশুদ্ধ পদার্থ তার মৌলিক গুনাবলী অক্ষুন্ন রেখে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহন করতে পারে তাকে মৌলিক পদার্থ বলে।

যৌগিক পদার্থ: যে পদার্থকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভাঙ্গলে দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় তাকে যৌগিক পদার্থ বলে।

পারমাণবিক তত্ত্ব বা পরমাণুবাদ হচ্ছে পদার্থের ধর্ম সম্পর্কিত একটি বৈজ্ঞানিক ধারণা। রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষায়, মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুই অতি ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি পদার্থের পারমাণবিক গঠনের আদর্শ তত্ত্বটি (তথা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান) সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে গাঠনিকভাবে সমস্ত পদার্থ কোয়ার্ক ও লেপটন নামের দুই শ্রেণীর অবিভাজ্য মৌলিক অতিপারমাণবিক কণা নিয়ে গঠিত। কোয়ার্ক ও লেপটন কণাগুলিকে 'পদার্থ কণা' এবং ফার্মিয়ন নামেও ডাকা হয়। এ পর্যন্ত ছয় ধরনের কোয়ার্ক এবং ছয় ধরনের লেপটন কণা আবিষ্কৃত হয়েছে।

কোয়ার্ক ও লেপটনগুলি মধ্যস্থতাকারী কিছু কণার সাহায্যে সংযুক্ত হয়ে প্রোটন ও নিউট্রন নামের যৌগিক কণা গঠন করে, যাদেরকে নিউক্লিয়ন বলা হয়। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে আমরা ব্যারিয়নজাত বা সাধারণ পদার্থ, তমোপদার্থ, তমোশক্তি ও প্রতি-পদার্থ সম্পর্কে জানতে পারি। যা বক্ষ্যমাণ আলোচনায় আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

অবস্থাভেদে পদার্থের প্রকারভেদ: অবস্থাভেদে পদার্থকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

1. কঠিন পদার্থ
2. তরল পদার্থ
3. বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থ
4. প্লাজমা পদার্থ

কঠিন পদার্থ: কঠিন পদার্থের নিদিষ্ট আকার ও আয়তন আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এর আকার ও আয়তনের পরিবর্তন হয় না। পদার্থের এই অবস্থাকে কঠিন পদার্থ বলে। যেমন: ইট, পাথর, লোহা, কাঠ ইত্যাদি।

তরল পদার্থ: তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন আছে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট আকার নেই। একে যে পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রের আকার ধারণ করে। পদার্থের এই অবস্থাকে তরল পদার্থ বলে। যেমন: পানি, তৈল, দুধ ইত্যাদি।

বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থ: বায়বীয় পদার্থের স্থায়ী কোনো আকার বা আয়তন নেই। কিছু পরিমান গ্যাস একটি ছোট পাত্রকে যে রূপ ভাবে পূর্ণ করতে পারে একটি বড় পাত্রকেও সে রূপ ভাবে পূর্ণ করতে পারে। পদার্থের এ অবস্থাকে বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থ বলে। যেমন: অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বনডাই অক্সাইড ইত্যাদি।

প্লাজমা পদার্থ: আয়নিত গ্যাস ও ইলেকট্রনের সমন্বয়ে গঠিত পদার্থের চতুর্থ অবস্থাকে প্লাজমা বলে। প্লাজমা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। প্লাজমা হচ্ছে আয়নিত গ্যাস যেখানে মুক্ত ইলেকট্রন এবং ধনাত্মক আয়নের সংখ্যা প্রায় সমান। উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপে গ্যাসীয় পদার্থ আয়নিত অবস্থায় থাকে। এটিই পদার্থের প্লাজমা অবস্থা। যেমন: নক্ষত্রের মধ্যে প্লাজমা অবস্থা দেখা যায়।

সহজভাবে বলতে গেলে, যখন কোনো গ্যাসকে অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়, তখন তার পরমাণু থেকে ইলেকট্রনগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে ধনাত্মক আয়ন এবং মুক্ত ইলেকট্রনের একটি মিশ্রণ তৈরি হয়, যা বিদ্যুৎ পরিবাহী। পদার্থের এই বিশেষ আয়নিত অবস্থাকেই 'প্লাজমা' বলে।

প্লাজমা পদার্থের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ—

আয়নিত অবস্থা: প্লাজমা হলো গ্যাসীয় পদার্থের এমন একটি রূপ যেখানে অণু বা পরমাণুগুলো ভেঙে আয়নে পরিণত হয়।
তড়িৎ পরিবাহিতা: মুক্ত ইলেকট্রন থাকার কারণে প্লাজমা অত্যন্ত ভালো বিদ্যুৎ পরিবাহী।
চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব: প্লাজমা কণাগুলো আধানযুক্ত হওয়ায় এরা বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
মহাজাগতিক উপস্থিতি: দৃশ্যমান মহাবিশ্বের ৯৯% প্লাজমা দিয়ে গঠিত। অবশিষ্ট ১% -এ রয়েছে গ্রহাণু, ধূমকেতু এবং বিভিন্ন গ্রহ যারা কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থের তৈরি।

প্লাজমা পদার্থবিদ্যা নামে পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা সক্রিয়ভাবে প্লাজমা নিয়ে মৌলিক গবেষণা, ডাস্টি (কমপ্লেক্স) প্লাজমা, কোয়ান্টাম প্লাজমা, শিল্প প্লাজমা, ডেনস প্লাজমা, ফোকাস ডিভাইস এবং কন্ট্রোল্ড থার্মোনিউক্লিয়ার ফিউশন –এর বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তাত্ত্বিক, কম্পিউটেশনাল এবং পরীক্ষামূলক গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছে।

মাত্রাভেদে পদার্থের প্রকারভেদ: কোনো বস্তুর অবস্থান বা আকার বোঝাতে সর্বনিম্ন যতগুলো স্থানাঙ্ক (Coordinate) প্রয়োজন হয়, তাকে ঐ বস্তুর মাত্রা (Dimensions) বলে। মাত্রাভেদে পদার্থ বা বস্তু তিন প্রকার। যথা—

1. একমাত্রিক পদার্থ (1D material)
2. দ্বিমাত্রিক পদার্থ (1D material)
3. ত্রিমাত্রিক পদার্থ (1D material)

একমাত্রিক পদার্থ: যে সকল বস্তু বা পদার্থকে একটিমাত্র স্থানাঙ্ক দ্বারা নির্ধারণ করা হয়, তাদেরকে একমাত্রিক বস্তু বা পদার্থ বলে। যেমন: চিকন সুতা।

দ্বিমাত্রিক পদার্থ: যে সকল বস্তু বা পদার্থকে দুইটিমাত্র স্থানাঙ্ক দ্বারা নির্ধারণ করা হয়, তাদেরকে দ্বিমাত্রিক বস্তু বা পদার্থ বলে। যেমন: পাতলা কাগজ।

ত্রিমাত্রিক পদার্থ: যে সকল বস্তু বা পদার্থকে তিনটি স্থানাঙ্ক দ্বারা নির্ধারণ করা হয়, তাদেরকে ত্রিমাত্রিক বস্তু বা পদার্থ বলে। যেমন: ইট।

পদার্থের ধর্ম

পদার্থের ধর্ম দুই প্রকার। যথা–
1. সাধারণ ধর্ম (General property) এবং
2. বিশেষ ধর্ম (Special Property)।

সাধারণ ধর্ম: যে ধর্ম সকল পদার্থেরই কম-বেশি রয়েছে তাকে পদার্থের সাধারণ ধর্ম বলে। যেমন– ওজন, বিস্তৃতি, রোধ, স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদি।

বিশেষ ধর্ম: যে ধর্ম সকল পদার্থের নেই তাকে পদার্থের বিশেষ ধর্ম বলে। যেমন– তারতা (Visco), পাততা, দৃঢ়তা, ভঙ্গুরতা ইত্যাদি ধর্ম কেবলমাত্র কঠিন পদার্থের বেলায় দেখা যায়। এসব ধর্ম কঠিন পদার্থের বিশেষ ধর্ম। সান্দ্রতা (Viscosity) তরল ও বায়বীয় পদার্থের বিশেষ ধর্ম। পৃষ্ঠটান বা তলটান (Surface Tension) তরল পদার্থের বিশেষ ধর্ম।

বিজ্ঞান: পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পদ্ধতিগতভাবে যে সুসংবদ্ধ জ্ঞান অর্জন হয় সেই জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান।

পদার্থবিজ্ঞান

বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থ এবং শক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে পদার্থবিজ্ঞান বলে। পদার্থবিজ্ঞান (Physics) শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'ফুসিকে' (fusiky) থেকে যার অর্থ– 'প্রকৃতি সম্প্রর্কিত জ্ঞান'। অন্যভাবে বলা যায়, পদার্থ ও শক্তির অন্তর্নিহিত দর্শন হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান। পদাথবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণের আলোকে বস্তু ও শক্তির রূপান্তর ও সম্পর্ক উদঘাটন এবং পরিমাণগতভাবে তা প্রকাশ করা।

পদার্থবিজ্ঞানের প্রকারভেদ: পদার্থবিজ্ঞান দুইভাগে বিভক্ত। যথা—

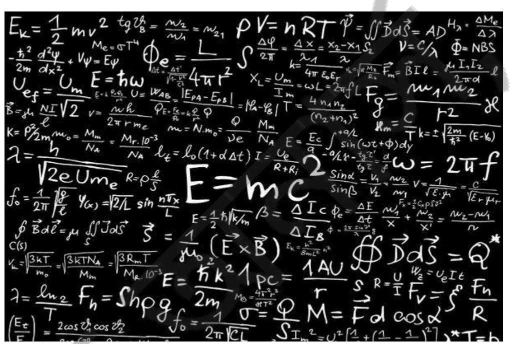
1. চিরায়ত বা চিরচারিত বা সনাতনী বা ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞান
2. আধুনিক বা মর্ডান বা কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান

চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান: চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান বা সনাতনী পদার্থবিজ্ঞান বা ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স হলো আধুনিক ও অধিক বিস্তৃত তত্ত্বের আভির্ভাবের পূর্বে প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সম্মিলন। অন্যভাবে বলা যায়, যে পদার্থবিজ্ঞানে ভর, শক্তি, সময় বা কাল, দৈর্ঘ্য ইত্যাদিকে নিরপেক্ষ বা স্বাধীন বা পরম বিবেচনা করা হয় তাকে চিরায়ত বা ক্ল্যাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞান বলে।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান: কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান ও আপেক্ষিকতত্ব কে কেন্দ্র করে যে পদার্থবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তাকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান বলে। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান, পারমাণবিক স্কেলে পদার্থ ও শক্তির আলোচনা করে বিধায় একে কোয়ান্টাম বা কণা পদার্থবিজ্ঞান নামেও অভিহিত করা হয়। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ধারণাসমূহ বেশ জটিল হওয়ায় এর কোনো ঘটনা ব্যাখায় প্রায়ই চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হয়।

পদার্থবিজ্ঞানের শাখা

পদার্থবিজ্ঞান হলো বিজ্ঞান এর সবচেয়ে প্রাচীন শাখা গুলোর মধ্যে একটি। পদার্থবিজ্ঞান হল সেই বিজ্ঞান যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন সূত্রের সাহায্যে আমাদের এই চারপাশের মহাবিশ্বে ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলির সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করা ও বিভিন্ন গাণিতিক মডেলের সাহায্যে উপস্থাপন করা।



সর্ববিষয়ক তত্ব (Theory of Everything): সর্ববিষয়ক তত্ব হলো এমন একটি একক, সমন্বিত মৌলিক তত্ব, যা দিয়ে মহাবিশ্বের সব মৌলিক বল ও সব কণার আচরণ একসাথে, সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে। পদার্থবিদ্যার আদিযুগ থেকেই বিজ্ঞানীদের একটি মূল লক্ষ্য ছিল, প্রকৃতিতে দেখা আপাত ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাকে একই নিয়মের আওতায় এনে ব্যাখ্যা করা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়েছে মূলত দুইটি ধারায়— একীভূতকরণ (Unification) এবং সাধারণীকরণ (Generalization)। এর মাধ্যমে প্রকৃতির ক্রমশ বৃহত্তর অংশকে অল্প সংখ্যক মৌলিক নীতির সাহায্যে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে ব্যাখ্যায় সর্বাধিক সরলতা ও ঐক্য আনা যায়। চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো এমন একটি একক তত্ত্বে পৌঁছানো, যা সমগ্র প্রকৃতিকে একসাথে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। মহাবিশ্বের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞান দুটি ভিন্ন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে— সাধারণ আপেক্ষিক তত্ব, যা মহাকর্ষ ও বৃহৎ স্কেলের ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করে, এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্স, যা অতি ক্ষুদ্র জগতের নিয়মাবলি নির্ধারণ করে। কিন্তু এই দুই তত্ত্বের গাণিতিক ভাষা ও নিয়মাবলী পরস্পরের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবু বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, প্রকৃতির গভীরে নিশ্চয়ই এমন একটি সর্ববিষয়ক তত্ব বা মাস্টার সূত্র লুকিয়ে আছে, যা এই দুই ভিন্ন মতবাদকে একই সুতোয় গেঁথে মহাবিশ্বের একক ও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারবে। অর্থাৎ সর্ববিষয়ক তত্ব হলো বিজ্ঞানের সেই পরম সত্য, যা দিয়ে একটি পরমাণুর কম্পন থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের জন্ম; সবকিছুর উত্তর পাওয়া যাবে।

প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ যোগ্য ঘটনা গুলোকে কতগুলো বিশেষ বিশেষ শাখায় ভাগ করা হয়েছে। যদিও বা পদার্থবিজ্ঞান সব ক্ষেত্র একটি একক তত্ব তথা সর্ববিষয়ক তত্ত্বের অধীন হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এই ধারণা টি এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। পদার্থবিজ্ঞানের মূল শাখাগুলো নিম্নোক্ত প্রকারের—

চিরায়ত বা চিরচারিত বা সনাতনী বা ক্লাসিকাল বলবিজ্ঞান: চিরচারিত বলবিজ্ঞানে বস্তুসমূহের উপর বলের প্রভাবের পদার্থ বৈজ্ঞানিক মডেল আলোচনা করা হয়। এই মডেল নিষ্পত্তিমূলক। এই বলবিদ্যা কে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সীমা হিসাবে ধরা হয়। চিরচারিত বলবিদ্যা কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—

1. নিউটনীয় চিরচারিত বলবিদ্যা
2. আপেক্ষিকতা ভিত্তিক বলবিদ্যা

নিউটনীয় চিরচারিত বলবিদ্যা: নিউটনের গতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গঠিত বলবিদ্যা।

আপেক্ষিকতা ভিত্তিক বলবিদ্যা: আইনস্টাইন এর বিশেষ আপেক্ষিক তত্ব ও সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গঠিত বলবিদ্যা।
কোয়ান্টাম মেকানিক্স: এই শাখায় পারমানবিক ও অতি-পারমানবিক ব্যবস্থা সমূহ ও বিকিরণের সাথে এদের সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ যোগ্য রাশির সাহায্যে আলোচনা করা হয়। এই বলবিজ্ঞানে শক্তি কে শক্তির প্যাকেট হিসেবে গণ্য করা হয় যাদের কোয়ান্টা বলে। এই বলবিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণ যোগ্য কণাগুলোর সম্ভাবনাভিত্তিক বা পরিসংখ্যান ভিত্তিক ভাবে ওয়েব ফাংশনের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়।
তড়িৎ-চৌম্বকীয় তত্ব: এই শাখায় তড়িৎ ক্ষেত্রের গাণিতিক মডেল আলোচনা করা হয়। তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্র সর্বত্র বিস্তৃত এবং বৈদ্যুতিক চার্জ যুক্ত কণার উপর বল প্রয়োগ করতে পারে। ঠিক একই ভাবে চার্জ যুক্ত কণাও তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের উপর বল প্রয়োগ করতে পারে।
পরিসংখ্যানভিত্তিক বলবিদ্যা ও তাপগতিবিদ্যা: এই শাখা গুলোতে তাপ কার্য ও এনট্রপি আলোচিত হয়। তাপগতিবিদ্যায় বড়ো আকারের ব্যবস্থার শক্তি এবং তার উপর চাপ, তাপমাত্রা, আয়তন ও যান্ত্রিক কাজ ইত্যাদির প্রভাব আলোচনা করা হয়। পরিসংখ্যান ভিত্তিক বলবিজ্ঞানে macroscopic ব্যবস্থার microscopic উপাদান গুলি তে পরিসংখ্যানের পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে তাপগতিবিদ্যার macroscopic ব্যবস্থা ও চিরচারিত বা কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ব্যাখ্যা করা পদার্থের পারমানবিক আচরণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়। অর্থাৎ, তাপগতিবিজ্ঞান (Thermodynamics) পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে তাপশক্তি ও তাপমাত্রা এবং এরসাথে শক্তি ও কাজের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এছাড়াও পদার্থ বিজ্ঞান এর আরো বেশকিছু শাখা রয়েছে যেমন—

শব্দবিজ্ঞান: কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে দিয়ে যান্ত্রিক স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের সঞ্চালনের অধ্যয়ন সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
ইলেকট্রনিক্স: এটি ফলিত পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা যেটি ইলেকট্রনের প্রভাব ও আচরণ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে বিভিন্ন উপাদান, যন্ত্রপাতি (যেমন ইলেকট্রন টিউব, ট্রানজিস্টর, সমন্বিত বর্তনী ইত্যাদি) নির্মাণ, পরিমার্জন, পরিবর্ধন করে। ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে তড়িৎ শক্তি।
কৃষি পদার্থবিজ্ঞান (Agrophysics): কৃষিবিদ্যার গবেষণায় পদার্থ বিদ্যার প্রয়োগ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
ভূ-পদার্থবিজ্ঞান: ভূগোল ও পদার্থ বিদ্যার সমন্বয়ে গঠিত বিজ্ঞান।
জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যাবিজ্ঞান: বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তু যেমন: গ্রহ , নক্ষত্র, ছায়াপথ, কৃষ্ণবিবর ইত্যাদির গতি সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
জীব-পদার্থবিদ্যা: জীব বিজ্ঞান ও পদার্থ বিদ্যার সমন্বয়ে গঠিত বিজ্ঞান।
রাসায়নিক-পদার্থবিজ্ঞান: রসায়নের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে পদার্থ বিদ্যার প্রয়োগ।
গণনামূলক পদার্থবিজ্ঞান: পদার্থ বিদ্যার গবেষণায় অ্যালগরিদমের প্রয়োগ ও তৎ সংক্রান্ত গবেষণা।
ঘণীভূত পদার্থবিজ্ঞান: ঘণীভূত পদার্থের ভৌত অবস্থা অধ্যয়নে পদার্থ বিদ্যার প্রয়োগ।
পার্টিকেল ফিজিক্স বা কণা পদার্থবিজ্ঞান: পারমানবিক ও অতি-পারমানবিক কণা ভৌত অবস্থা ও বিকিরণ সংক্রান্ত অধ্যয়ন।
প্লাজমা পদার্থবিজ্ঞান: পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থের চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ প্লাজমা (Plasma) এবং এর বৈশিষ্ট্য, আচরণ ও প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে প্লাজমা পদার্থবিজ্ঞান বলা হয়।

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এছাড়াও আরো অনেক নিত্যনতুন শাখার সংযোজন হয়ে চলেছে ভবিষ্যতেও হতে থাকবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

গবেষণা (Research): সঠিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কোনো কিছু জানার নামই গবেষণা।
নীতি (Principle): কোনো যুক্তিতর্ক বা কাজের ভিত্তি হিসেবে যে মৌলিক সূত্র বা তত্বকে বিবেচনা করা হয় তাই হচ্ছে নীতি। অর্থাৎ নীতি হলো, ভৌত আচরণ সমূহের প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গঠিত সাধারণ বৈজ্ঞানিক ধারণা।
ধারণা (Concept): ধারণা হচ্ছে, তত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে ভাবনা। ধারণা মানুষের মনের বিমূর্ত একটি বস্তু। এটিকে ভাষা বা প্রতীকের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়। ধারণা হচ্ছে তাত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের শাখা যা প্রাকৃতিক ঘটনাটকে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা এবং পূর্বাভাস দেওয়ার একটি গাণিতিক মাধ্যম এবং শরীরের যান্ত্রিক মাধ্যমে প্রকাশ।
অনুমান (Inference): অনুমান হচ্ছে এক বা একাধিক যুক্তির মাধ্যমে তাদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি। ধারণা ও অনুমানের পার্থক্য হলো, ধারণা এমন একটি জিনিস যা প্রমাণ ছাড়া সত্য হিসাবে গৃহীত হয়। অনুমান হচ্ছে একটি ধারণা, যা সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে সত্য বলে মনে করা হয়।
অনুকল্প (Hypothesis): অনুকল্প হলো এমন ব্যাখ্যা বা সুত্র বা তত্ব যা এখনো সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় নি। অর্থাৎ অনুকল্প হলো, বৈজ্ঞানিক ঘটনার প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা।
তত্ব (Theory): কোনো কিছু ব্যাখ্যার জন্য যে আনুষ্ঠানিক চিন্তাধারা, ভাব বা ধারণা তাকে তত্ব বলে। অর্থাৎ তত্ব হলো, প্রকল্প ও প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মের সমন্বয়ে গৃহীত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত।
সুত্র (Law): সাধারণভাবে কোনো নির্দিষ্ট শর্তে বা অবস্থায় সবসময় কি ঘটবে তার বর্ণনা হলো সুত্র। অর্থাৎ সুত্র হলো, পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত তত্বকে উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ।
স্বীকার্য বা স্বতঃসিদ্ধ (Postulates): সাধারণত কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ব একটি সার্বিক বিবৃতি দিয়ে শুরু হয়, একে স্বীকার্য বলে। অর্থাৎ স্বীকার্য হলো, এমন এক ধরনের উক্তি বা সাক্ষ্য যা এখনো প্রমাণ হয়নি বা ব্যাখ্যা করা হয়নি, কিন্তু সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় বা স্বীকার করে নেওয়া হয়।

গবেষণা পদ্ধতি (Method of Investigation):

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লব্ধ সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান। প্রাচীনকালে বিজ্ঞানে পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক ভাবে ছিলো না। এটি প্রবর্তনের পুরো কৃতিত্বই মুসলিম বিজ্ঞানীদের। ইসলামী স্বর্ণযুগে এটা প্রবর্তিত হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন আল হাইয়াম (Al Hazen), আল বিরুনী, ইবনে সিনা, ওমর খৈয়ামের মত মুসলিম পলিম্যাথরা (বহুবিদ্যাবিশারদ)। মুসলিম বিজ্ঞানীদের পথ অনুসরণ করে ষোড়শ শতাব্দিতে ইউরোপে একটি মেথড চালু করেন গ্যালিলিও গ্যালিলি। এই মেথডের নাম Method of Investigation। মেথডটি নিম্নরূপ—

1. পর্যবেক্ষণ (observation)
2. বৈজ্ঞানিক অনুমান (hypothesis)
3. আইন/তত্ত্ব (law/theory)
4. যাচাই (verification)

মুসলিমদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে গবেষণার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। মুসলিমদের পবিত্র ধর্মীয়গ্রন্থ কুরআনুল কারীমের (২:২১৯) নং নুসুসে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা গবেষণা করতে পারো।" গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করে কুরআনের (৬:৫০) নং আয়াতে বলা হয়েছে, "(হে রাসূল) আপনি বলে দিন, অন্ধ (যারা গবেষণা করে না) ও চক্ষুমান (যারা গবেষণা করে, তারা) কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা করো না?"

গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ অপরিহার্য। যথা—

1. অনুসন্ধিৎসু ও কৌতূহলী মনোবৃত্তি।
2. সুনির্দিষ্ট বিচরণক্ষেত্র।
3. সুবিন্যস্ত অনুমান।
4. পর্যবেক্ষণ যোগ্য তথ্যের সহজলভ্যতা।
5. বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কৌশল।
6. ফলাফল উপস্থাপনের যৌক্তিক কৌশল।

গবেষণা বা সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার ধাপ সমূহ—

1. সমস্যা সনাক্তকরণ।
2. সমস্যা বিশ্লেষণ।
3. অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (গবেষণা প্রশ্ন, উদ্দেশ্য এবং অনুমান বিন্যাস করা)।
4. তথ্য সংগ্রহ (গবেষণার জন্য সঠিক পদ্ধতি ও ডিজাইন নির্বাচন)।
5. তথ্য সংগ্রহ বা বিশ্লেষণ।
6. অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই (ডেটা বা তথ্য প্রক্রিয়াকরন ও বিশ্লেষণ)।
7. সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা ফলাফল প্রদান।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়— পদার্থবিজ্ঞানের যে কোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধান শুরু হয় **সমস্যা বোঝা ও তথ্য সংগ্রহ** দিয়ে। এরপর **প্রাথমিক অনুমান বা মানের যাচাই** করা হয়, যা হিসাবের দিকনির্দেশ দেয়। তার পর **প্রাসঙ্গিক সূত্র বা নীতি নির্বাচন ও সমীকরণ স্থাপন** করা হয়। সবশেষে **গাণিতিক হিসাব সম্পন্ন করা ও ফলাফল যাচাই** করা হয়, যাতে উত্তর সঠিক এবং যৌক্তিক হয়।

পদার্থবিজ্ঞানের পরিসর

বিজ্ঞানের চাবিকাঠি হলো পদার্থবিজ্ঞান। পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি মৌলিক শাখা কেননা এর নীতিগুলোই বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাসমূহের ভিত্তি তৈরি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের একটি মূল নীতি যা হচ্ছে পরমাণুর গঠন থেকে শুরু করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দান পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিস্তৃত এলাকার মূল ভিত্তি। প্রকৌশলশাস্ত্র থেকে শুরু করে চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সমুদ্রবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান থেকে শুরু করে মনোবিজ্ঞান সর্বত্র পদার্থবিজ্ঞানের পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির প্রভূত ব্যবহার রয়েছে।

পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ

আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞানের ফসল। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির পেছনে রয়েছে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নানা আবিষ্কার ও উদ্ভাবন। বিজ্ঞানের কোনো জাতীয় বা রাজনৈতিক সীমা নেই। বিজ্ঞানের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ সকল জাতির সকল মানুষের জন্য। প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের উন্নয়নে অবদান রেখে আসছেন।

গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (খ্রিস্টপূর্ব 460-370) ধারণা দেন যে পদার্থের অবিভাজ্য একক রয়েছে। তিনি একে নাম দেন এটম বা পরমাণু। পারমাণু সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা বর্তমান ধারণার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা হলেও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

থেলিস (খ্রিস্টপূর্ব 624-569) সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য বিখ্যাত। তিনি লোডস্টোনের চৌম্বক ধর্ম সম্পর্কেও জানতেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে পিথাগোরাস (খ্রিস্টপূর্ব 527-497) একটি স্মরণীয় নাম। বিভিন্ন জ্যামিতিক উপপাদ্য ছাড়াও কম্পমান তারের উপর তাঁর কাজ অধিক স্থায়ী অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানে বাদ্যযন্ত্র ও সংগীত বিষয়ক যে স্কেল রয়েছে তা তারের কম্পন বিষয়ক তাঁর অনুসন্ধানের আংশিক অবদান।

গ্রিক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস (খ্রিস্টপূর্ব 287-212) লিভারের নীতি ও তরলে নিমজ্জিত বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল উর্ধ্বমুখী বলের সূত্র আবিষ্কার করে ধাতুর ভেজাল নির্ণয়ে সক্ষম হন। তিনি গোলীয় দর্পণের সাহায্যে সূর্যের রশ্মি কেন্দ্রীভূত করে আগুন ধরানোর কৌশলও জানতেন।

আর্কিমিডিসের পর কয়েক শতাব্দীকাল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মন্থর গতিতে চলে। প্রকৃতপক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার পুনর্জীবন ঘটেনি। এই সময় পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতা বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিল বাইজানটাইন ও মুসলিম সভ্যতার জ্ঞানের ধারা।

মুসলিমরা বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই সময় পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা আলোক তত্ত্বের ক্ষেত্রে ইবনে আল হাইথাম (965- 1039) এবং আল হাজেন (965-1038) এর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আল-খোয়ারিজমী (806-870) সমীকরণ সমাধান ও আলজেব্রার প্রবর্তক; গণিতকে পদার্থবিজ্ঞানের বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারযোগ্য করেছেন। ইবনে সিনা (980-1037) পদার্থের গঠন, ভর ও গতিশক্তি নিয়ে তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা করেছেন। আল-রাসি (865-925) রসায়ন ও পদার্থের ধর্মাবলী নিয়ে বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

আল-ফারাবি (872-950) পদার্থবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক মডেল এবং গাণিতিক বিশ্লেষণে অবদান রেখেছেন। আল-বিরুনি (973-1050) পৃথিবীর আকৃতি, ঘূর্ণন, ভর ও গতি নিয়ে সূক্ষ্ম পরীক্ষামূলক গবেষণা করেছেন। জাবির ইবনে হায়ান (750-813) আধুনিক রসায়নের প্রবর্তক; ধাতু ও যৌগের পরিবর্তন সম্পর্কিত গবেষণা করেছেন।

টলেমি (127-151) ও অন্যান্য প্রাচীন বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে কোনো বস্তু দেখার জন্য চোখ নিজে আলোক রশ্মি পাঠায়। আল হাজেন এই মতের বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে বস্তু থেকে আমাদের চোখে আলো আসে বলেই আমরা বস্তুকে দেখতে পাই। আতশি কাচ নিয়ে পরীক্ষা তাঁকে উত্তল লেন্সের আধুনিকতত্ত্বের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

মুসলিম বিজ্ঞানী আল-মাসুদী (896-956) প্রকৃতির ইতিহাস সম্পর্কে ৩০ খন্ডের একটি এনসাইক্লোপিডিয়া লেখেন। এই বইয়ে বায়ুকলের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশে এই বায়ুকলের সাহায্যে তড়িৎশক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে।

রজার বেকন (1214-1294) ছিলেন পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবক্তা। তাঁর মতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমেই বিজ্ঞানের সব সত্য যাচাই করা উচিত। লিউনার্দো দা ভিঞ্চি (1452-1519) পনেরো শতকের শেষদিকে পাখির ওড়া পর্যবেক্ষণ করে উড়োজাহাজের একটি মডেল তৈরি করেছিলেন। তিনি মূলত একজন চিত্রশিল্পী হলেও বলবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য জ্ঞান ছিল। ফলে তিনি কিছু সাধারণ যন্ত্র দক্ষতার সাথে উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন।

গ্যালিলিও -নিউটনীয় যুগে এবং তারও আগে সংখ্যায় কম হলেও কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় তারা অপরিসীম অবদানও রাখেন।

ডা. গিলবার্ট (1540-1603) চুম্বকত্ব নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা ও তত্ত্ব প্রদানের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। আলোর প্রতিসরণের সূত্র আবিষ্কার করেন জার্মানির স্নেড়বল (1591-1626)।

হাইগেন (1626-1695) দোলকীয় গতি পর্যালোচনা করেন, ঘড়ির যান্ত্রিক কৌশলের বিকাশ ঘটান এবং আলোর তরঙ্গ তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। রবার্ট গুক (1635-1703) পদার্থের স্থিতিস্থাপক ধর্মের অনুসন্ধান করেন।

বিভিন্ন চাপে গ্যাসের ধর্ম বের করার জন্য পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালান রবার্ট বয়েল (1627-1691)। ভন গুয়েরিক (1602- 1686)) বায়ু পাম্প আবিষ্কার করেন। রোমার (1644-1710) বৃহস্পতির একটি উপগ্রহের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে আলোর বেগ পরিমাপ করেন, কিন্তু তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের কেউই বিশ্বাস করেননি যে আলোর বেগ এত বেশি হতে পারে।

কোপার্নিকাস যে সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের ধারণা উপস্থিত করেন কেপলার (1571-1630) সেই ধারণার সাধারণ গাণিতিক বর্ণনা দেন তিনটি সূত্রের সাহায্যে। কেপলারের সাফল্যের মূল ভিত্তি হলো, তিনি প্রচলিত বৃত্তাকার কক্ষপথের পরিবর্তে উপবৃত্তাকার কক্ষপথ কল্পনা করেন। গ্রহদের গতিপথ সম্পর্কে তাঁর গাণিতিক সূত্রগুলোর সত্যতা তিনি যাচাই করলেন তার গুরু টাইকোব্রাহের (1546-1601) পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যের দ্বারা।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ইউরোপকে শিল্প বিপ্লবের দিকে নিয়ে যায়। জেমস ওয়াটের (1736-1819) আবিষ্কৃত বাষ্পীয় ইঞ্জিন শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনা ঘটে ইতালির বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর (1564-1642) হাতে। তিনিই প্রথম দেখান যে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সুশৃঙ্খলভাবে ভৌত রাশির সংজ্ঞা প্রদান ও এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ বৈজ্ঞানিক কর্মের মূল ভিত্তি।

গাণিতিক তত্ব নির্মাণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে সে তত্ত্বের সত্যতা যাচাইয়ের বৈজ্ঞানিক ধারার সূচনা করেন গ্যালিলিও। আর এর পূর্ণতা দান করেন নিউটন (1642-1727)। গ্যালিলিও সরণ, গতি, ত্বরণ, সময় ইত্যাদির সংজ্ঞা প্রদান ও এদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করেন। ফলে তিনি বস্তুর পতনের নিয়ম আবিষ্কার ও সৃতিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন।

নিউটন তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার দ্বারা আবিষ্কার করেন বলবিদ্যা ও বলবিদ্যার বিখ্যাত তিনটি সূত্র এবং বিশ্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র। আলোক, তাপ ও শব্দবিজ্ঞানেও তার অবদান আছে। গণিতের নতুন শাখা ক্যালকুলাসও তাঁর আবিষ্কার।

হ্যান্স ক্রিস্চিয়ান ওয়েরস্টেড (1777-1851) দেখান যে, তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া আছে। এই আবিষ্কার মাইকেল ফ্যারাডে (1791-1867), হেনরী (1797-1879) ও লেঞ্জ (1804-1865) কে পরিচালিত করে চৌম্বক ক্রিয়া তড়িৎ প্রবাহ উৎপাদন করে এই ঘটনা আবিষ্কারের দিকে। আসলে এটি হলো যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া আবিষ্কার।

1864 সালে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (1831-1879) দেখান যে আলো এক প্রকার তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গ। তিনি তড়িৎ ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্রকে একীভূত করে তাড়িত চৌম্বক তত্ত্বের বিকাশ ঘটান।

1888 সালে হেনরিখ হার্টজও (1857-1894) একই রকম বিকিরণ উৎপাদন ও উদ্ঘাটন করেন। 1896 সালে মার্কনী (1874-1937) এ রকম তরঙ্গ ব্যবহার করে অধিক দূরত্বে মোর্সকোডে সংকেত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তারও আগে বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু (1858 – 1937) তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তি প্রেরণ করতে সক্ষম হন। এভাবে বেতার যোগাযোগ জন্মলাভ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রনজেন (1845-1923) এক্স-রে এবং বেকেরেল (1852-1908) ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন।

বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটে। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (1858-1947) আবিষ্কার করেন বিকিরণ সংক্রান্ত কোয়ান্টাম তত্ব। আলবার্ট আইনস্টাইন (1879-1955) প্রদান করেন আপেক্ষিক তত্ব। এই দুই তত্ব আগেকার পরীক্ষালব্ধ ফলাফলকেই শুধু ব্যাখ্যা করেনি, এমন ভবিষ্যদ্বাণীও প্রদান করেছে যা পরে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের (1871-1937) পরমাণু বিষয়ক নিউক্লীয় তত্ব ও নীলস বোরের (1885 – 1962) হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন স্তরের ধারণা পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটে 1938 সালে। এই সময় ওটো হান (1879-1968) ও স্ট্রেসম্যান (1902-1980) বের করেন যে নিউক্লীয়াস ফিশনযোগ্য। ফিশনের ফলে একটি বড় ভর সংখ্যা বিশিষ্ট নিউক্লীয়াস প্রায় সমান ভর সংখ্যা বিশিষ্ট দুটি নিউক্লীয়াসে রূপান্তরিত হয় এবং নিউক্লীয়াসের ভরের একটি অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়- জন্ম নেয় নিউক্লীয় বোমা ও নিউক্লীয় চুল্লির। বর্তমানে আমরা নিউক্লীয়াস থেকে যে শক্তি পাচ্ছি তা অতীতের সকল উৎস থেকে প্রাপ্ত শক্তির তুলনায় বিপুল। দিন দিন নিউক্লীয় শক্তি শক্তির একটি প্রধান উৎস হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এই শতাব্দীতেই তাত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে বিকাশ লাভ করেছে কোয়ান্টাম তত্ব, আপেক্ষিক তত্ব প্রভৃতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসর সত্যেন্দ্র নাথ বসু (1894-1974) তাত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্বের একটি শুদ্ধতর প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তার তত্ব বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন নামে পরিচিত। তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ একশ্রেণির মৌলিক কণাকে তাঁর নামানুসারে “বোসন” বলা হয়।

তিনজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী পাকিস্তানের প্রফেসর আবদুস সালাম (1926-1996), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেলডন গ্লাশো (1932-) এবং স্টিভেন ওয়াইনবার্গ (1933-) একীভূত ক্ষেত্রতত্বের বেলায় মৌলিক বলগুলোকে একত্রীকরণের ক্ষেত্রে তাড়িত দুর্বল বল আবিষ্কার করে অসামান্য অবদান রাখেন। তারও আগে ভারতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর রমন (1888-1970) রমনপ্রভাব আবিষ্কার করেন।

বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পদার্থবিজ্ঞান রাখছে গুরুত্বপূর্ণ আবদান। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের পাশাপাশি তেজস্ক্রিয় আইসোটপ বিভিন্ন চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও অসামান্য অবদান রাখছে। বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের আরেকটি গুরত্বপূর্ণ অগ্রগতি মহাশূন্য অভিযান। চাঁদে মানুষের পদার্পণ থেকে শুরু করে মঙ্গল গ্রহে অভিযানসহ মহাশূন্য স্টেশনে মাসের পর মাস মানুষের বসবাস জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসামান্য অগ্রগতি। কৃত্রিম উপগ্রহ আবহাওয়ার পূর্বাভাস দানে কিংবা যোগাযোগকে সহজ করতে চমৎকার অবদান রাখছে। আর ইলেকট্রনিক্স তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিয়ে এসেছে বিপ্লব, পাল্টে দিচ্ছে জীবন যাপন প্রণালি। রেডিও, টেলিভিশন, ডিজিটাল ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, আই প্যাড আর কম্পিউটারের কথা এখন ঘরে ঘরে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ও কম্পিউটার মানুষের ক্ষমতাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিজ্ঞান চর্চায় কতিপয় বিজ্ঞানীদের অবদান

বিজ্ঞানীর নাম	জন্ম-মৃত্যু	অবদান
হাসান ইবনে আল-হায়সাম (আল হাজেন)	আনুমানিক ৯৬৫ –১০৪০ খ্রিঃ	তিনি আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের জনক হিসেবে উল্লেখিত হন, আলোকবিদ্যার নীতি এবং বিশেষ করে দর্শনানুভূতির ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম আলোর কণাতত্ত্বের প্রবর্তন করেন। তার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী কাজ হচ্ছে তার কিতাবুল মানাজির (আলোকবিদ্যার গ্রন্থ)।
আর্কিমিডিস	খ্রিঃ পূর্ব ২৮৭ – ২১২	লিভারের নীতি, তরলে নিমজ্জিত বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল উর্ধ্বমূখী বলের সূত্র আবিষ্কার, গোলীয় দর্পনের সাহায্যে সূর্যের রশ্মি কেন্দ্রীভূত করে আগুন ধরানোর কৌশল উদ্ভাবন।
গ্যালিলিও	১৫৬৪ – ১৬৪২ খ্রিঃ	পড়ন্ত বস্তুর সূত্র আবিষ্কার, পেন্ডুলাম আবিষ্কার, সৃতিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন, দূরবীক্ষণের সাহায্যে মহাকাশ নিরীক্ষণ এবং নক্ষত্র আবিষ্কার করেন। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। শ্রেষ্ঠ রচনা 'The Law of Motion'.
স্যার আইজ্যাক নিউটন	১৬৪২ – ১৭২৭ খ্রিঃ	বলবিদ্যার তিনটি সূত্র এবং মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার, ক্যালকুলাস এবং প্রতিফলক টেলিস্কোপ আবিষ্কার, আলোর কণা তত্ত্বের প্রবক্তা। ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তার 'ফিলোসোফিয়া ন্যাচারালস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকস' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।
থমাস ইয়ং	১৭৭৩ – ১৮২৯ খ্রিঃ	বলবিদ্যা ও পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কিত তত্ত্ব, আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব, চোখের সংবেদনশীল বর্ণগুলো নিয়ে তত্ত্ব, আলোর ব্যতিচার সম্পর্কিত দ্বি-চির পরীক্ষা আবিষ্কার করেন।
মাইকেল ফ্যারাডে	১৭৯১ – ১৮৬৭ খ্রিঃ	তড়িৎ বিশ্লেষণ সূত্র এবং তড়িৎ চৌম্বক আবেশের আবিষ্কারক। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চৌম্বক ক্রিয়া তড়িৎ প্রবাহ উৎপাদন করেন।
আর্নেস্ট রাদারফোর্ড	১৮৭১ – ১৯৩৭ খ্রিঃ	সোলার সিস্টেম এটম মডেলের উদ্ভাবক। তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে গবেষণার জন্য নোবেল পুরষ্কার পান।
আলবার্ট আইনস্টাইন	১৮৭৯ – ১৯৫৫ খ্রিঃ	প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর নির্ভর করে ফোটন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। আপেক্ষিক তত্ত্ব ও ভর-শক্তি সমীকরণ আবিষ্কার করেন।
ম্যাক্স প্লাঙ্ক	১৮৫৮ – ১৯৪৭ খ্রিঃ	বিকিরণ বিষয়ক কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রদান করেন।

সাম্প্রতিক পদার্থবিজ্ঞান

স্ট্রিং তত্ত্ব

আপেক্ষিক তত্ত্ব মহাকর্ষের আচরণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম, কারণ মহাকর্ষ স্থান-কালকে বাঁকানোর মাধ্যমে ভর ও শক্তির প্রভাব দেখায়, কিন্তু তড়িৎ-চুম্বক বল, দুর্বল ও শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বল ব্যাখ্যা করতে পারে না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব (স্ট্যান্ডার্ড মডেল) এই তিনটি বলের কণাগত বিনিময় ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু কোয়ান্টাম গ্রাভিটি না থাকায় মহাকর্ষকে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। এই কারণে দুই তত্ত্বেরই নিজ নিজ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আপেক্ষিক তত্ত্ব মনে করে মহাবিশ্ব সাংতত্যক (continuous) বা নিরবিচ্ছিন্ন; অন্যদিকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব মনে করে মহাবিশ্ব বিচ্ছিন্ন (discrete) বা কণা আকারে বিভক্ত। এই বিপরীতধর্মী ধারণাগুলোর সমন্বয়ই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই প্রেক্ষাপটে স্ট্রিং তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মহাকর্ষের সাংতত্যক প্রকৃতি ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপন করে একটি সর্বজনীন তত্ত্ব (Theory of Everything) গঠনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়, যার মাধ্যমে ব্ল্যাকহোলের কেন্দ্রবিন্দু বা মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রাথমিক মুহূর্ত সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে। **স্ট্রিং তত্ত্ব** হলো মহাবিশ্বের গঠন ব্যাখ্যার একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিক ধারণা। এ তত্ত্বানুসারে, মহাবিশ্বের মৌলিক উপাদানগুলো কোনো ছোট বিন্দুসদৃশ কণা নয়, বরং অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং কম্পনরত একমাত্রিক সূতা বা 'স্ট্রিং'। এই সূক্ষ্ম স্ট্রিংগুলো বিভিন্নভাবে কম্পিত হয়, আর সেই কম্পনের পার্থক্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়। ফলে, স্ট্রিং-এর কম্পন অনুযায়ী কণার আধান, ভর এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়।

অতিপারমাণবিক কণা, প্রমিত মডেল ও হিগস বোসন

কণা পদার্থবিদ্যার প্রমিত মডেল (Standard Model of Particle Physics) হলো একটি সুসংগঠিত তাত্ত্বিক কাঠামো, যা মহাবিশ্বে বিদ্যমান মৌলিক কণা, তাদের ধর্ম এবং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যা করে। এই মডেল অনুসারে দৃশ্যমান সব পদার্থ ও শক্তি, নির্দিষ্ট কিছু অতিপারমাণবিক কণার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, এবং তাদের মধ্যে মৌলিক বলের আদান প্রদানের ফলেই মহাবিশ্বের সব ভৌত ঘটনা সংঘটিত হয়। প্রমিত মডেল জানায় পদার্থ কোন মৌলিক কণা দিয়ে গঠিত, সেই কণাগুলো কিভাবে মিথস্ক্রিয়া করে, এবং কোন কণাগুলো পদার্থ তৈরি করে আর কোন কণাগুলো বল বহন করে।

প্রমিত মডেলে অতিপারমাণবিক কণাগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়— ফার্মিওন কণা; যা পদার্থ গঠন করে। অপরটি বোসন কণা; যা মৌলিক বল বহন করে। পরবর্তীতে হিগস ক্ষেত্র ও হিগস বোসন কণার ধারণা সংযোজনের মাধ্যমে কণার ভরের উৎস ব্যাখ্যা করে প্রমিত মডেল তার পূর্ণতা লাভ করে। দৈনন্দিন জীবনে পদার্থকে আমরা অণু, পরমাণু, প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের মাধ্যমে গঠিত বলে মনে করা হয়। একসময় ধারণা ছিল প্রোটন ও নিউট্রনই মৌলিক কণা ফলে এদের আর ভাঙ্গা যায় না। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান দেখিয়েছে, প্রোটন ও নিউট্রন আরো ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত, যাদেরকে অতিপারমাণবিক কণা বলা হয়। প্রমিত মডেল অনুসারে পদার্থ সৃষ্টিকারী ফার্মিওন দিয়েই পরমাণু, অণু এবং শেষ পর্যন্ত দৃশ্যমান সব বস্তু গঠিত হয়। ফার্মিওন দুই প্রকার— কোয়ার্ক এবং লেপটন।

ফার্মিওন কথাগুলোর ভর ও দুর্বল আন্তঃক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য একরকম নয়, কিন্তু তারা একই গাঠনিক ছাঁচে বারবার পুনরাবৃত্ত হয়। এই পুনরাবৃত্ত স্তরগুলোকে জেনারেশন বা প্রজন্মে ভাগ করা হয়। প্রতিটি জেনারেশনে কণাগুলোর চার্জ ও বলের ধরন একই থাকে; পার্থক্য মূলত ভর ও স্থায়িত্বে। অপেক্ষাকৃত হালকা ও স্থিতিশীল কণাগুলো প্রথম জেনারেশনে, আর বেশি ভারী ও কম স্থিতিশীল কণাগুলো পরের জেনারেশনে অন্তর্ভুক্ত।

কোয়ার্ক পরিচিতি: কোয়ার্ক হলো কণা পদার্থবিজ্ঞানের প্রমিত মডেলের অন্তর্গত এক শ্রেণির মৌলিক ফার্মিয়ন কণা, যাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ গঠন নেই; তবে তারা এককভাবে অস্তিত্বশীল নয় এবং সবসময় সবল নিউক্লীয় বলের মাধ্যমে আবদ্ধ অবস্থায় যৌগিক কণা (হ্যাড্রন) গঠন করে। কোয়ার্ককে ছয়টি ভিন্ন ফ্লেভারে বিভক্ত করা হয়। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে খণ্ডিত বৈদ্যুতিক আধান, স্পিন, এবং একটি বিশেষ ধর্ম, যাকে রং চার্জ (Color Charge) বলা হয়। রং চার্জ হলো কোয়ার্কের শক্তিশালী (Strong) মিথস্ক্রিয়া বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত একটি তাত্ত্বিক ধারণা। এটি বৈদ্যুতিক চার্জের মতো ধনাত্মক বা ঋণাত্মক নয়; বরং কল্পিত কিছু রং দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এখানে চার্জ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে শক্তির উপস্থিতি ও মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতি নির্দেশ করার জন্য। রং চার্জ তিন প্রকার— লাল, নীল ও সবুজ। এদের বিপরীত এন্টি-রং চার্জ হলো যথাক্রমে সায়ান, ম্যাজেন্টা ও হলুদ। প্রতিটি কোয়ার্ক একটি নির্দিষ্ট রং চার্জ বহন করে এবং তার সংশ্লিষ্ট এন্টিকোয়ার্ক বহন করে সেই রং এর বিপরীত এন্টি-রং চার্জ। নিচে কোয়ার্ক পরিবারের পরিচিতি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো—

কোয়ার্ক পরিবার

প্রজন্ম	কণা			স্থির ভর	এন্টিকণা		
	ফ্লেভার	রঙ চার্জ	তড়িৎ চার্জ (e) 1e = 1.6×10^{-19} C		ফ্লেভার	রঙচার্জ	তড়িৎ চার্জ (e) 1e = 1.6×10^{-19} C
১ম জেনারেশন	আপ কোয়ার্ক (u)	লাল আপ কোয়ার্ক (u_r)	+⅔	2.2 MeV/c^2	এন্টি আপ কোয়ার্ক ($\bar{u}$)	সায়ান এন্টি আপ কোয়ার্ক ($\bar{u}_c$)	−⅔
		নীল আপ কোয়ার্ক (u_β)				ম্যাজেন্টা এন্টি আপ কোয়ার্ক ($\bar{u}_m$)	
		সবুজ আপ কোয়ার্ক (u_g)				হলুদ এন্টি আপ কোয়ার্ক ($\bar{u}_y$)	
	ডাউন কোয়ার্ক (d)	লাল ডাউন কোয়ার্ক (d_r)	−⅓	4.7 MeV/c^2	এন্টি ডাউন কোয়ার্ক ($\bar{d}$)	সায়ান এন্টি ডাউন কোয়ার্ক ($\bar{d}_c$)	+⅓
		নীল ডাউন কোয়ার্ক (d_β)				ম্যাজেন্টা এন্টি ডাউন কোয়ার্ক ($\bar{d}_m$)	
		সবুজ ডাউন কোয়ার্ক (d_g)				হলুদ এন্টি ডাউন কোয়ার্ক ($\bar{d}_y$)	
বৈশিষ্ট্য	এরা সবচেয়ে হালকা ও স্থিতিশীল কোয়ার্ক। তাই মহাবিশ্বে এদের উপস্থিতি সর্বাধিক।						

কোয়ার্ক পরিবার							
	কণা				এন্টিকণা		
প্রজন্ম	ফ্লেভার	রঙ চার্জ	তড়িৎ চার্জ (e) 1e = 1.6×10^{-19} C	স্থির ভর	ফ্লেভার	রঙচার্জ	তড়িৎ চার্জ (e) 1e = 1.6×10^{-19} C
২য় জেনারেশন	চার্ম কোয়ার্ক (c)	লাল চার্ম কোয়ার্ক (c_r)	+⅔	1270 MeV/c^2	এন্টি চার্ম কোয়ার্ক ($\bar{c}$)	সায়ান এন্টি চার্ম কোয়ার্ক ($\bar{c}_c$)	–⅔
		নীল চার্ম কোয়ার্ক (c_β)				ম্যাজেন্টা এন্টি চার্ম কোয়ার্ক ($\bar{c}_m$)	
		সবুজ চার্ম কোয়ার্ক (c_g)				হলুদ এন্টি চার্ম কোয়ার্ক ($\bar{c}_y$)	
	স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক (s)	লাল স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক (s_r)	–⅓	96 2.2 MeV/c^2	এন্টি স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক ($\bar{s}$)	সায়ান এন্টি স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক ($\bar{s}_c$)	+⅓
		নীল স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক (s_β)				ম্যাজেন্টা এন্টি স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক ($\bar{s}_m$)	
		সবুজ স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক (s_g)				হলুদ এন্টি স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক ($\bar{s}_y$)	
বৈশিষ্ট্য	১ম জেনারেশন অপেক্ষা ভারী ও অস্থিতিশীল; উচ্চ শক্তি বা মহাজাগতিক রশ্মিতে বিদ্যমান।						
৩য় জেনারেশন	টপ কোয়ার্ক (t)	লাল টপ কোয়ার্ক (t_r)	+⅔	172760 GeV/c^2	এন্টি টপ কোয়ার্ক ($\bar{t}$)	সায়ান এন্টি টপ কোয়ার্ক ($\bar{t}_c$)	–⅔
		নীল টপ কোয়ার্ক (t_β)				ম্যাজেন্টা এন্টি টপ কোয়ার্ক ($\bar{t}_m$)	
		সবুজ টপ কোয়ার্ক (t_g)				হলুদ এন্টি টপ কোয়ার্ক ($\bar{t}_y$)	
	বটম কোয়ার্ক (b)	লাল বটম কোয়ার্ক (b_r)	–⅓	4.18 GeV/c^2	এন্টি বটম কোয়ার্ক ($\bar{b}$)	সায়ান এন্টি বটম কোয়ার্ক ($\bar{b}_c$)	+⅓
		নীল বটম কোয়ার্ক ($b\beta$)				ম্যাজেন্টা এন্টি বটম কোয়ার্ক ($\bar{b}_m$)	
		সবুজ বটম কোয়ার্ক (b_g)				হলুদ এন্টি বটম কোয়ার্ক ($\bar{b}_y$)	
বৈশিষ্ট্য	এগুলো সবচেয়ে ভারী ও সবচেয়ে অস্থিতিশীল কোয়ার্ক। টপ কোয়ার্ক এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে ভারী।						

একাধিক কোয়ার্ক একত্রে যুক্ত হয়ে হ্যাড্রন নামক যৌগিক কণা তৈরি করে। হ্যাড্রন প্রধানত দুই প্রকার— ব্যারিয়ন ও মেসন। বিজোড় সংখ্যক (সাধারণত তিনটি) কোয়ার্ক মিলিত হয়ে ব্যারিয়ন গঠন করে। প্রোটন (uud) গঠিত দুইটি আপ কোয়ার্ক ও একটি ডাউন কোয়ার্ক দিয়ে, আর নিউট্রন (udd) গঠিত একটি আপ কোয়ার্ক ও দুইটি ডাউন কোয়ার্ক দিয়ে, তাই এরা ব্যারিয়নজাত কণা। এই গঠনগত পার্থক্যের কারণেই প্রোটনের বৈদ্যুতিক আধান ধনাত্মক এবং নিউট্রনের আধান শূন্য। অন্যদিকে, মেসন তৈরি হয় সমান সংখ্যক কোয়ার্ক ও এন্টিকোয়ার্কের জোড় যুগল দ্বারা। যে সকল কণা প্রচলিত ব্যারিয়ন বা মেসন গঠনের নিয়ম অনুসরণ করে না, তাদেরকে ব্যতিক্রমী হ্যাড্রন (Exotic hadron) বলা হয়। ছয় ফ্লেভারের কোয়ার্কের বিভিন্ন রং চার্জের সংমিশ্রণে স্থিতিশীল, অস্থিতিশীল কিংবা তাত্ত্বিকভাবে অসংখ্য ব্যারিয়ন, এন্টি-ব্যারিয়ন, মেসন ও এন্টি-মেসন কণার অস্তিত্ব সম্ভব। কোয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো— এরা সবসময় তিনটির গুচ্ছ (ব্যারিয়ন) অথবা কোয়ার্ক–অ্যান্টিকোয়ার্ক জোড়া (মেসন) কিংবা ব্যতিক্রমী গুচ্ছ আকারে অবস্থান করে। এর কারণ হলো সবল নিউক্লীয় বল, যা গ্লুয়ন কণার মাধ্যমে কোয়ার্কগুলোর মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। কোয়ার্কগুলোকে আলাদা করার চেষ্টা করলে তাদের মধ্যকার আকর্ষণ বল রাবার ব্যান্ডের মতো ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। অত্যধিক শক্তি প্রয়োগ করলে সেই শক্তি ভরে রূপান্তরিত হয়ে নতুন কোয়ার্ক–অ্যান্টিকোয়ার্ক যুগল সৃষ্টি করে এবং এর ফলে নতুন হ্যাড্রনের জন্ম হয়। সাধারণভাবে একটি কণা ও তার প্রতিকণা সংস্পর্শে এলে তারা পরস্পর ধ্বংস হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তবে মেসনের ভেতরে থাকা কোয়ার্ক ও অ্যান্টিকোয়ার্ক একে অপরকে ধ্বংস করে না, কারণ অ্যানাইহিলেশনের জন্য তড়িৎ চার্জ ও রং চার্জে বৈপরীত্য এবং স্পিনে উপযুক্ত সামঞ্জস্য প্রয়োজন। মেসনের কোয়ার্ক ও অ্যান্টিকোয়ার্কের এই বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতার কারণে তারা স্থিতিশীলভাবে সহাবস্থান করতে পারে। তদুপরি, তড়িৎ চার্জযুক্ত মেসন কণাগুলো প্রোটন ও নিউট্রনের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে প্রোটনকে নিউট্রনে এবং নিউট্রনকে প্রোটনে রূপান্তরিত করতেও সক্ষম।

লেপটন পরিচিতি: লেপটন হলো কণা পদার্থবিজ্ঞানের প্রমিত মডেলের অন্তর্গত এক শ্রেণির মৌলিক ফার্মিয়ন কণা, যাদের কোনো অভ্যন্তরীণ গঠন নেই— অর্থাৎ এদের ভেতরে কোয়ার্ক বা অন্য কোনো উপ-কণা পাওয়া যায় না। প্রমিত মডেল অনুযায়ী লেপটন মোট ছয় প্রকার এবং তারা তিনটি জেনারেশনে বিভক্ত। তড়িৎ অবস্থার (electric charge) ভিত্তিতে লেপটনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়— চার্জ লেপটন এবং নিউট্রাল লেপটন। চার্জ লেপটনের মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রন, মিউওন ও টাও, যাদের প্রত্যেকেরই ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক আধান আছে এবং এরা তড়িৎচৌম্বক বলের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে। অন্যদিকে নিউট্রাল লেপটন হলো নিউট্রিনো, যাদের কোনো বৈদ্যুতিক আধান নেই এবং যারা প্রধানত দুর্বল নিউক্লিয়ার বলের মাধ্যমে ক্রিয়া করে। সবচেয়ে পরিচিত লেপটন হলো ইলেকট্রন, যা পরমাণুর গঠন ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইলেকট্রনের পাশাপাশি মিউওন ও টাও নামের অপেক্ষাকৃত ভারী লেপটন রয়েছে। নিউট্রিনো বলতে তিনটি জেনারেশনের সকল নিউট্রিনোকেই বোঝায়—ইলেকট্রন নিউট্রিনো, মিউওন নিউট্রিনো ও টাও নিউট্রিনো। লেপটনের সঙ্গে কোয়ার্কের কোনো গঠনগত সম্পর্ক নেই, ফলে লেপটনের রং চার্জ নেই এবং তারা সবল নিউক্লিয়ার বলের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে না। একটি লেপটন যখন তার নিজস্ব প্রতিকণার সংস্পর্শে আসে, তখন অ্যানাইহিলেশন ঘটে; এতে কণা ও এন্টিকণা পরস্পর ধ্বংস হয়ে শক্তিতে (সাধারণত ফোটন বা আলোক কণায়) রূপান্তরিত হয়। নিম্নে লেপটন পরিবারের পরিচিতি ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো—

লেপটন পরিবার

প্রজন্ম	তড়িতাবস্থা	কণা: ফ্লেভার	কণা: চার্জ	স্থির ভর	এন্টিকণা: ফ্লেভার	এন্টিকণা: চার্জ
১ম জেনারেশন	চার্জযুক্ত লেপটন	ইলেকট্রন (e^-)	–1	0.511 MeV/c²	পজিট্রন (e^+)	+1
	চার্জহীন লেপটন	ইলেকট্রন নিউট্রিনো (ν_e)	0	< 0.0002 eV/c²	এন্টি ইলেকট্রন নিউট্রিনো ($\bar{\nu}_e$)	0
বৈশিষ্ট্য	সবচেয়ে হালকা ও স্থিতিশীল, দৈনন্দিন পদার্থে সরাসরি ভূমিকা রাখে।					
২য় জেনারেশন	চার্জযুক্ত লেপটন	মিউওন (μ^-)	–1	105.66 MeV/c²	এন্টি মিউওন (μ^+)	+1
	চার্জহীন লেপটন	মিউওন নিউট্রিনো (ν_μ)	0	< 0.17 eV/c²	এন্টি মিউওন নিউট্রিনো ($\bar{\nu}_\mu$)	0
বৈশিষ্ট্য	ইলেকট্রনের মতো আচরণ করে। ইলেকট্রনের থেকে প্রায় 200 গুণ ভারী ও অস্থিতিশীল।					
৩য় জেনারেশন	চার্জযুক্ত লেপটন	টাউ (τ^-)	–1	1776.86 MeV/c²	এন্টি টাউ (τ^+)	+1
	চার্জহীন লেপটন	টাউ নিউট্রিনো (ν_τ)	0	< 0.12 eV/c²	এন্টি টাউ নিউট্রিনো ($\bar{\nu}_\tau$)	0
বৈশিষ্ট্য	এগুলো সবচেয়ে ভারী লেপটন এবং খুব দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত।					

বোসন পরিচিতি: স্ট্যান্ডার্ড মডেলে বোসন কণা হলো সেই শ্রেণির মৌলিক কণা, যাদের প্রধান ভূমিকা হচ্ছে প্রকৃতির মৌলিক বলসমূহ বহন ও এক কণার প্রভাব অন্য কণার কাছে পৌঁছে দেওয়া। কোয়ার্ক ও লেপটন যেখানে বস্তু (matter) গঠন করে, সেখানে বোসন কণাগুলো কাজ করে এক ধরনের বার্তাবাহক বা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে— যার মাধ্যমে কণাগুলোর মধ্যে বল ও ক্রিয়া সংঘটিত হয়। বোসন কণার নামকরণ করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামানুসারে। তিনি দেখান যে, কিছু কণা একে অপরকে বাধা না দিয়ে একই অবস্থায় একসাথে থাকতে পারে। এই ধারণা থেকেই বোসন কণার তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে তা আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী, কণাগুলো নির্দিষ্ট কোয়ান্টাম অবস্থায় অবস্থান করে। কোয়ান্টাম অবস্থা বলতে বোঝায়— একটি কণার শক্তি, গতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের একটি নির্দিষ্ট অনুমোদিত বিন্যাস। বোসন কণাগুলো এমনভাবে আচরণ করে যে, বহু বোসন একই কোয়ান্টাম অবস্থায় থাকতে পারে। এই কারণেই একটি আলো উৎস থেকে অসংখ্য ফোটন একসাথে নির্গত হতে পারে কিংবা লেজারের মতো তীব্র ও সুসংহত আলো তৈরি সম্ভব হয়। বোসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো স্পিন (Spin)। স্পিন হলো কণার একধরনের মৌলিক কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্য, যা ঘূর্ণনগতির মতো আচরণ বোঝায়, তবে এটি ক্লাসিকাল বা সাধারণ ঘূর্ণনের মতো নয়। কোয়ান্টাম স্পিন, কণার অভ্যন্তরীণ ঘূর্ণনগত আচরণ— যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু কণার আচরণ এবং পরস্পরের মেলবন্ধন পুরোপুরি নির্ধারণ করে। অর্থাৎ স্পিন কেবল কণার ঘূর্ণন নয়; এটি কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্য, যা কণার অভ্যন্তরীণ ঘূর্ণন এবং একে অপরের সঙ্গে কণার সম্পর্ক ও ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। স্ট্যান্ডার্ড মডেলে বোসন কণাগুলোকে মূলত বলবাহী কণা (force carrier) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাদের স্পিন অনুযায়ী বোসনকে সাধারণত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়—

- **স্কেলার বোসন (Spin 0):** যেমন Higgs বোসন, যা কণার ভর এবং স্ট্যান্ডার্ড মডেলের বিভিন্ন শক্তি বণ্টনের সঙ্গে সম্পর্কিত।
- **ভেক্টর বা গেজ বোসন (Spin 1):** যেমন ফোটন, W ও Z বোসন, গ্লুয়ন। এগুলো প্রকৃতির মৌলিক বল বহনকারী, যেখানে ফোটন তড়িৎচৌম্বক বল বহন করে, গ্লুয়ন শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বল বহন করে, আর W ও Z বোসন দুর্বল নিউক্লিয়ার বলের জন্য দায়ী।
- **টেনসর বোসন (Spin 2, সম্ভাব্য Graviton):** মহাকর্ষ বল বহন করার জন্য প্রস্তাবিত, তবে স্ট্যান্ডার্ড মডেলে নেই এবং পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হয়নি।

কোনো বোসন কণার রং চার্জ থাকে না শুধুমাত্র গ্লুয়ন ব্যতিক্রমী, কারণ গ্লুয়নের আট প্রকারের প্রতিটি কণার মধ্যে একটি রং চার্জ ও একটি ভিন্ন রং চার্জের এন্টি-রং চার্জ একসাথে উপস্থিত থাকে। এই দুটি রঙ চার্জ কণার মধ্যে আলাদাভাবে স্বকীয়তা বজায় রেখে সহাবস্থান করে; এটি কোনো নতুন রং চার্জ তৈরি করে না। বরং গ্লুয়নের মাধ্যমে শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বলের শক্তি বিনিময় ও মিথস্ক্রিয়ার সময় প্রতিটি রঙ চার্জ স্বতন্ত্রভাবে কার্যকর থাকে। সব বোসনের ভর সমান নয়। ফোটন ও গ্লুয়ন ভরহীন, তাই তাদের প্রভাব বড় দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যদিকে W ও Z বোসনের ভর বেশি হওয়ায় দুর্বল নিউক্লিয়ার বল খুব স্বল্প দূরত্বে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ বোসনের ভরের দ্বারা'ই নির্ধারণ হয় বলটির কার্যক্ষমতা ও সীমা। স্ট্যান্ডার্ড মডেল মহাকর্ষকে এখনও পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কারণ মহাকর্ষ কেবল কণার ওপর বল প্রয়োগ করে না, বরং স্থান-কালের গঠন পরিবর্তন করে— যা বর্তমান কোয়ান্টাম কাঠামোর সাথে একীভূত করা যায় না। তাই মহাকর্ষ বলবাহী গ্রাভিটন (Graviton) কণা এখনো পরীক্ষামূলকভাবে পাওয়া যায়নি। বোসন কণা ছাড়া স্ট্যান্ডার্ড মডেল কার্যত অচল। কোয়ার্ক ও লেপটন থাকলেও, বোসন না থাকলে কণাগুলোর মধ্যে কোনো বল, পারস্পরিক ক্রিয়া বা স্থিতিশীল গঠন সম্ভব হতো না। বোসন কণা হলো প্রকৃতির কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা, যা মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম স্তরে শক্তি, বল ও প্রভাবের আদান–প্রদান নিশ্চিত করে।

হিগস বোসন পরিচিতি: হিগস বোসন আধুনিক কণা পদার্থবিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কণা, যার সাথে অন্যান্য মৌলিক কণার ভর নির্ধারণের বিষয়টি গভীরভাবে যুক্ত। স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুযায়ী, কণার ভর কোনো জন্মগত বা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এটি একটি বিশেষ ভৌত প্রক্রিয়ার ফল। এই প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে রয়েছে একটি সর্বব্যাপী ও অদৃশ্য ক্ষেত্র, যাকে হিগস ক্ষেত্র বলা হয়। এই হিগস ক্ষেত্র সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত অবস্থায় বিদ্যমান এবং সব মৌলিক কণাই এই ক্ষেত্রের মধ্য দিয়েই চলাচল করে। হিগস ক্ষেত্রকে সহজভাবে এমন একটি মাধ্যম হিসেবে কল্পনা করা যায়, যার ভেতর দিয়ে কণাগুলো চলার সময় ক্ষেত্রটির সঙ্গে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটে। কোনো কণা যদি এই ক্ষেত্রের সাথে বেশি মাত্রায় মিথস্ক্রিয়া করে, তবে সে কণা তত বেশি ভর লাভ করে এবং তার গতি তুলনামূলকভাবে কমে যায়। আবার যে কণাগুলো হিগস ক্ষেত্রের সঙ্গে খুব সামান্য বা প্রায় কোনো মিথস্ক্রিয়াই করে না, তারা ভরহীন বা প্রায় ভরহীন অবস্থায় থাকে। এই কারণেই আলোর কণা ফোটনের কোনো ভর নেই, ফলে এটি সর্বোচ্চ গতিতে চলতে পারে। অথচ অন্যান্য অনেক মৌলিক কণা তুলনামূলকভাবে ভারী ও ধীরগতিসম্পন্ন। হিগস বোসন আসলে এই হিগস ক্ষেত্রেরই একটি কণারূপ প্রকাশ। অর্থাৎ হিগস ক্ষেত্র যখন ক্ষুদ্র মাত্রায় উত্তেজিত বা কম্পিত হয়, তখন সেই উত্তেজনার প্রকাশ হিসেবেই হিগস বোসনের অস্তিত্ব দেখা যায়। যেমন একটি শান্ত জলাশয়ে সামান্য আন্দোলন সৃষ্টি হলে আলাদা কোনো বস্তু জন্ম না নিয়ে পানির মধ্যেই একটি ঢেউ তৈরি হয়, ঠিক তেমনই হিগস বোসন হিগস ক্ষেত্র থেকে আলাদা কিছু নয়— এটি হিগস ক্ষেত্রেরই দৃশ্যমান ও পরিমাপযোগ্য রূপ। তাই বলা যায়, হিগস ক্ষেত্রের কণাই হলো হিগস বোসন। হিগস বোসন কোনো মৌলিক বল বহন করে না এবং কণাগুলোর মধ্যে বলের আদান–প্রদান ঘটায় না। তবুও একে বোসন বলা হয়, কারণ বোসন কণার শ্রেণিবিভাগ শুধু বল বহনের ওপর নির্ভর করে না। বোসন হলো সেই শ্রেণির কণা, যেগুলো নির্দিষ্ট কোয়ান্টাম নিয়ম অনুসরণ করে এবং একই অবস্থায় একাধিক কণা একসাথে অবস্থান করতে পারে। হিগস বোসন এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো পূরণ করে বলেই এটি বোসন কণার শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত, যদিও এর ভূমিকা অন্যান্য বলবাহী বোসনের থেকে ভিন্ন। দীর্ঘ সময় ধরে হিগস বোসন কেবল তাত্ত্বিক ধারণা হিসেবেই পরিচিত ছিল। অবশেষে আধুনিক পরীক্ষামূলক প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ২০১২ সালে ইউরোপীয় গবেষণা সংস্থা CERN-এর লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে এই কণার অস্তিত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

এর মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘদিন অনুপস্থিত অংশ পূর্ণতা লাভ করে। হিগস ক্ষেত্র না থাকলে কোনো মৌলিক কণাই ভর অর্জন করতে পারত না। এর ফলে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারপাশে আবদ্ধ থাকতে পারত না, পরমাণু গঠিত হতো না, অণু, পদার্থ, গ্রহ, নক্ষত্র কিছুই সৃষ্টি হতো না। অর্থাৎ আজ আমরা যে সুসংগঠিত মহাবিশ্ব দেখি, তার অস্তিত্বই সম্ভব হতো না। এই গভীর তাৎপর্যের কারণেই অনেক বিজ্ঞানী ও গণমাধ্যম প্রতীকী অর্থে হিগস বোসনকে 'গড পার্টিকেল' বা 'ঈশ্বর কণা' নামে অভিহিত করেন। যার মাধ্যমে বোঝানো হয়, এই কণার আবিষ্কার মহাবিশ্বের গঠন ও অস্তিত্বের একেবারে মৌলিক রহস্য উন্মোচনে সহায়তা করে। নিম্নে বোসন পরিবারের পরিচিতি ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো—

বোসন পরিবার

শ্রেণি	উপশ্রেণি	প্রকারভেদ	গেজ গ্রুপ	ভর (Gev/c^2)	তড়িৎ চার্জ	রং চার্জ	স্পিন	বাহক বল
স্কেলার বোসন	হিগস বোসন	H^0	–	125.10	0	নেই	0	কণার ভর প্রদান
ভেক্টর বোসন বা গেজ বোসন	ফোটন	γ	$U(1)_{EM}$	0	0	নেই	1	তড়িৎচৌম্বক
	W (Weak বোসন)	W^+	$SU(2)_L$	80.379	+1	নেই	1	দুর্বল নিউক্লিয়
		W^-			–1			
	Z (Zero বোসন)	Z^0	$SU(2)_L \times U(1)_Y$	91.19	0	নেই	1	ইলেক্ট্রো-উইক
	গ্লুয়ন (অকটেট)	g_1	$SU(3)_C$	0	0	$R\bar{B}$	1	সবল নিউক্লিয়
		g_2				$R\bar{G}$		
		g_3				$B\bar{R}$		
		g_4				$B\bar{G}$		
		g_5				$G\bar{R}$		
		g_6				$G\bar{B}$		
		g_7				$(R\bar{R}-B\bar{B})/\sqrt{2}$		
		g_8				$(R\bar{R}+G\bar{G}-2B\bar{B})/\sqrt{6}$		
টেনসর বোসন	গ্র্যাভিটন (তাত্ত্বিক)	G	–	0 (তাত্ত্বিক)	0	নেই	2	মহাকর্ষ

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে তাত্ত্বিকভাবে সম্ভাব্য বোসন কণার সংখ্যা সীমাহীন।

পদার্থবিজ্ঞানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের নাম ও ব্যবহার

যন্ত্রের নাম	ব্যবহার	যন্ত্রের নাম	ব্যবহার
অ্যানোমোমিটার	বায়ুর বেগ পরিমাপক যন্ত্র	সিসমোগ্রাফ	ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্র
অল্টিমিটার	উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র	স্পিডোমিটার	বস্তুর দ্রুতি পরিমাপক যন্ত্র
পাইরোমিটার	দূরবর্তী বস্তুর তাপ পরিমাপক যন্ত্র	সনোমিটার	শব্দের কম্পাঙ্ক পরিমাপক যন্ত্র
হাইড্রোলিক প্রেস	বলবৃদ্ধিকরণ যন্ত্র	ব্যারোস্কোপ	গ্যাসীয় পদার্থের প্লবতা পরিমাপক যন্ত্র
ম্যানোমিটার	গ্যাসের চাপ পরিমাপক যন্ত্র	ব্যারোমিটার	বায়ু চাপ পরিমাপক যন্ত্র
ট্যাকোমিটার	উড়োজাহাজ, মোটর-গাড়ী ইত্যাদির গতি পরিমাপক যন্ত্র	ক্যালরিমিটার	তাপ পরিমাপক যন্ত্র
হিপসোমিটার	থার্মোমিটারের ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক পরিমাপক যন্ত্র	থার্মোমিটার ও থার্মোস্টেট	তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র
স্পিরিট লেভেল	কোনো তলের আনুভূমিক পরিমাপক যন্ত্র	হাইড্রোমিটার	ঘনত্ব পরিমাপক যন্ত্র
ফোর্স গেজ	বল পরিমাপক যন্ত্র	SONAR ও ফ্যাদোমিটার	সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপক যন্ত্র

পরমাণু ও নিউক্লিয়ন সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য

নাম	ব্যাসার্ধ	চার্জ	ভর	আবিষ্কার
পরমাণু	10^{-10} m	নিরপেক্ষ	নিউক্লিয়াসে অবস্থিত নিউক্লিয়ন ও ইলেকট্রনের ভরের সমষ্টি	জন ডাল্টন, ১৮০৩ খ্রিঃ
নিউক্লিয়াস	10^{-10} m	ধনাত্মক	নিউক্লিয়াসে অবস্থিত নিউক্লিয়ন ভরের সমষ্টি	আর্নেস্ট রাদারফোর্ড, ১৯১১ খ্রিঃ
ইলেকট্রন	1.4×10^{-15} m	-1.6×10^{-19} C	9.1×10^{-32} kg	জে. জে. থমসন, ১৮৯৭ খ্রিঃ
নিউক্লিয়ন				
নাম	**ব্যাসার্ধ**	**চার্জ**	**ভর**	**আবিষ্কার**
প্রোটন	1.4×10^{-15} m	$+1.6\times10^{-19}$ C	1.673×10^{-27} kg	আর্নেস্ট রাদারফোর্ড, ১৯১৭ খ্রিঃ
নিউট্রন	1.4×10^{-15} m	নিরপেক্ষ	1.673×10^{-27} kg	জেমস চ্যাডউইক, ১৯৩২ খ্রিঃ

পদার্থবিজ্ঞানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বা তত্ত্ব সমূহ

আবিষ্কার বা প্রবর্তন	আবিষ্কারক বা প্রবর্তক	আবিষ্কার বা প্রবর্তন	আবিষ্কারক বা প্রবর্তক
পড়ন্ত বস্তু ও সরল দোলকের সূত্রাবলী	গ্যালিলিও	কণিকা (কণা) তত্ত্ব বা করপাস্কুলার থিওরি ও প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র	স্যার আইজ্যাক নিউটন
বস্তুর ভর, বল ও গতি সংক্রান্ত সূত্রাবলী	স্যার আইজ্যাক নিউটন	কণা তত্ত্ব ও দর্শনাভূতির সঠিক ব্যাখ্যা	হাসান ইবনে আল-হায়সাম (সর্ব প্রথম)
পৃষ্ঠটানের আণবিক তত্ত্ব	ল্যাপ্লাস	তরঙ্গ তত্ত্ব	হাইগেন
প্রান্তিক বেগের সমীকরণ	স্টোকস	তড়িৎ চৌম্বকীয় তত্ত্ব ও বেতার তরঙ্গ	জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল
তাপের যান্ত্রিক বা গতি বা আধুনিক মতবাদ	জুল	কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা তেজকণাবাদ	ম্যাক্স প্লাঙ্ক
প্লাটিনাম থার্মোমিটার	সিমেন	তেজস্ক্রিয়তা	বেকেরেল
পূর্ণ বিকিরণ পাইরোমিটার	ফেরী	প্রতিফলক দূরবীক্ষণ যন্ত্র	গ্রেগরী (সর্ব প্রথম)
তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র	জুল	আপেক্ষিক তত্ত্ব	আলবার্ট আইনস্টাইন
তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র	ক্লসিয়াস এবং কেলভিন	যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র	গ্যালিলিও
ভীনের সরণ সূত্র ও পঞ্চঘাত সূত্র	ভীন	নভো দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও গ্রহ সমূহ ঘূর্ণণের সূত্র	কেপলার
বিদ্যুৎ	ফ্যারাডে	আলোক তড়িৎ ক্রিয়া	ডব্লিউ স্মিথ
মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান নির্ণয়	ক্যাভেন্ডিস	ডিস্টিলেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তরল পদার্থের পৃথকীকরণ	জাবির ইবনে হাইয়ান
মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের উষ্ণতা নিরপেক্ষতার প্রমাণ	পয়েন্টিং ও ফিলিপস	পিনহোল ক্যামেরা	হাসান ইবনে আল-হায়সাম
থমসন ক্রিয়া	স্যার উইলিয়াম থমসন	প্যারাস্যুট	আব্বাস ইবনে ফিরনাস
সরল ভোল্টার কোষ	অ্যালেস্যান্ড্রো ভোল্টা	দূরবীক্ষণ যন্ত্র	হারসেল
ড্যানিয়েল কোষ	জন ড্যানিয়েল	বায়ুর তাপমাত্রা মাপার জন্য বায়ুমাপক যন্ত্র	ইবনে সিনা
লেকল্যান্স কোষ	জর্জেস লেকল্যান্স	দ্রাঘিমারেখা	ইবনে খুরদাদ
ওয়েস্টন ক্যাডমিয়াম কোষ	অ্যাডওয়ার্ড ওয়েস্টন	পেন্ডুলাম	ইবনে ইউনুস
ল্যাটিমার ক্লার্ক কোষ	ল্যাটিমার ও ক্লার্ক	জড়তত্ত্ব ও আলোর প্রতিসরণ তত্ত্ব	ইবনে আল হাইসাম
সীসা এসিড সঞ্চায়ক কোষ	প্লান্ট ১৮৫৯ খ্রিঃ	সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাপ	আল খাওয়ারেজমী
বাইনোমিয়াল থিউরাম	ওমর খৈয়াম	বেতার কম্পাঙ্ক জানালা	K. Jansky
বিশ্বের প্রথম মানচিত্রকার	ইবনে হাক্কল	লরেঞ্জ রূপান্তর সমীকরণ প্রতিপাদন	এইচ. এ. লরেঞ্জ
কাসিম আল-জাওয়াহিরি	শল্যচিকিৎসার যন্ত্রাংশ	মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ বল, গ্রহের আবর্তনের কারণ পড়ন্ত বস্তুর সূত্র সমূহের প্রমাণ	স্যার আইজ্যাক নিউটন
X-ray বা রনজেন রশ্মি	উইল হেলেম রনজেন	গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ	টাইকো ব্রাহে

পদার্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

পদার্থবিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করে: পদার্থবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হলো মহাবিশ্বের আচরণ সম্পর্কে অনুধাবন করা। বলতে গেলে কেনো এবং কিভাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতেই পদার্থবিজ্ঞানের উৎপত্তি। পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি মৌলিক শাখা কেননা এর নীতিগুলোই বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাসমূহের ভিত্তি তৈরি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের একটি মূল নীতি যা হচ্ছে পরমাণুর অভ্যন্তরের অবস্থা থেকে শুরু করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দান পযর্ন্ত বিজ্ঞানের বিস্তৃত এলাকার মৌল ভিত্তি। যদিও পদার্থ ও শক্তির অধ্যয়নই পদার্থবিজ্ঞানের মূল কাজ বলে বর্ণনা করা যায়, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন তথা প্রকৃতির নিয়মগুলো অনুধাবন করা। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পদার্থবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে, পরমাণু ধনাত্মকভাবে আহিত নিউক্লীয়াস দ্বারা গঠিত যার চার পাশে ইলেকট্রন ঘোরে। পরবর্তী পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে পাওয়া যায় যে নিউক্লীয়াস প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত। এখন পদার্থবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করছেন যে প্রোটন ও নিউট্রন আরো ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত।

পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে ভালোভাবে বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে যেমন সাহায্য করে তেমনি বিজ্ঞানের আনান্য শাখায় তার প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পদার্থবিজ্ঞানের ব্যবহারেই সম্ভবত পদার্থবিজ্ঞানকে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এর কেন্দ্রে পরিণত করেছে। উনিশ শতকের শেষার্ধে ইলেকট্রনের আবিষ্কারই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের উদ্ভাবন ঘটিয়েছে যা বস্তুবিজ্ঞান ও কোষ-জীববিদ্যায় বিপ্লব এনেছে। একদিকে পদার্থবিজ্ঞানে যেমন তত্ত্ব সৃষ্টি ও গণিতের প্রয়োগ আছে অপর দিকে এতে ব্যবহারিক উন্নয়ন বা বিকাশ যেমন প্রকৌশলশাস্ত্রও রয়েছে। রসায়নবিজ্ঞান, ভূ-তত্ব বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আবহাওয়াবিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে মৌলিক ব্যাখ্যা ও ধারণা গঠনে পদার্থবিজ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এছাড়া জীববিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞানের পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির প্রভূত ব্যবহার রয়েছে।

পদার্থবিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়মগুলো বর্ণনা করে: আমরা যে প্রাকৃতিক জগতে বাস করি, তা কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম যেমন নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র, শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি ইত্যাদি মেনে চলে। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে শিশুকাল থেকে এইসব নিয়মনীতি শিখে আসছি। এই জ্ঞান আমাদের জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক। প্রকৃতির কাজের নিয়ম-কানুন আমরা পাল্টাতে পারি না, নিয়মগুলোকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। এজন্য প্রয়োজন নিয়মগুলো সম্পর্কে আমাদের প্রচুর জ্ঞান। এছাড়াও আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবীতে অনুসন্ধান চালায় পদার্থবিজ্ঞান।

পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রগুলোর অনুসরণে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে: টেলিভিশন কী করে কাজ করে, রকেট কী করে মহাশূন্যে উড়ে যায়, কৃত্রিম উপগ্রহ কীভাবে পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে, ইন্টারনেট দিয়ে কীভাবে মুহূর্তে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ঘুরে আসা যায়, মোবাইল ফোন কীভাবে কাজ করে, সাবমেরিন কীভাবে পানিতে ডুবে থাকে ইত্যাদি বুঝতে হলে আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রগুলো জানতে হবে। এই সব প্রযুক্তির উদ্ভাবনের মূলে কাজ করছে পদার্থবিজ্ঞানে আবিষ্কৃত নিয়মাবলি।

পদার্থবিজ্ঞান অধ্যয়ন একটি প্রকৃষ্ট মানবিক প্রশিক্ষণ: পদার্থবিজ্ঞান পাঠে আমরা নতুন ধারণা লাভ করতে পারি। কী করে চিন্তা করতে হয়, কারণ দর্শাতে হয়, যুক্তি দিতে হয়, কীভাবে যুক্তিবিজ্ঞান ও এর নিকট আত্মীয় গণিতকে কাজে লাগাতে হয় পদার্থবিজ্ঞান তা আমাদের শিখিয়ে থাকে। এটি আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে এবং চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটায়।

পদার্থবিজ্ঞান আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে শেখায়: পদার্থবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারি। কী করে সঠিক পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ করতে হয়, পদার্থবিজ্ঞান পাঠে তা আমরা জানতে পারি।

স্থান ও কাল (Space and time)

বিজ্ঞান তথা পদার্থবিজ্ঞানে স্থান ও কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। কোনো ঘটনা বর্ণনা করতে আমাদের স্থান ও কালের প্রয়োজন হয়। ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে এবং কখন ঘটেছে -এটা না জানলে আমরা ঘটনাটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাব না। কোনো বস্তুর অবস্থান কোথায় এবং বস্তুটি কতটা জায়গা দখল করে তা বুঝতে স্থানের ধারণা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। কোন ঘটনা আগে ঘটেছে এবং কোন ঘটনা পরে ঘটেছে এবং কতক্ষণ ধরে ঘটেছে তা বুঝতে সময়ের ধারণা প্রয়োজন।

ইউক্লিডের ধারণা:

স্থানের জ্যামিতিক ধারণা প্রথম উপস্থাপনা করেন ইউক্লিড। আমাদের চারপাশে যা আছে সবই স্থান।

গ্যালিলিও-এর ধারণা:

গ্যালিলিও তাঁর সৃতিবিদ্যায় স্থান ও কালকে ব্যবহার করেছেন তার গতি ও ত্বরণের সূত্রে। এর ফলে পদার্থবিজ্ঞানে স্থান ও কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাশি হিসেবে গাণিতিক সমীকরণে প্রবেশ করেছে।

নিউটনের ধারণা

স্থান ও কালের ধারণা আরো স্পষ্ট ও পরিমাণগত রূপ গ্রহণ করেছে নিউটনের বলবিদ্যার মাধ্যমে। নিউটনীয় বা চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানে স্থান হচ্ছে ত্রিমাত্রিক এক বিস্তৃতি। স্থানের কোনো শুরু বা শেষ নেই। অসীম এর বিস্তৃতি। স্থানকে অতিক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায় অর্থাৎ স্থান নিরবচ্ছিন্ন। স্থান সমসত্ব অর্থাৎ স্থানের যে কোনো এলাকা অন্য এলাকা থেকে অভিন্ন। স্থান নিরপেক্ষ। স্থানের মধ্যে সব ঘটনা ঘটে এবং স্থানের বিস্তৃতির মধ্যেই সমস্ত বস্তুর অবস্থান কিন্তু স্থান কোনো বস্তু বা ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। স্থান যেমন বস্তু ও ঘটনা নিরপেক্ষ তেমনই সময় নিরপেক্ষ, ফলে কালের প্রবাহ স্থানকে বদলাতে পারে না।

নিউটনের ধারণা অনুসারে সময় বা কাল নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত হবে। কোনো বস্তু বা ঘটনার দ্বারা এই কালিক প্রবাহ প্রবাহিত হয় না। সময়ের কোনো শুরু বা শেষ নেই। সময়কে অতিক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ এর প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন। সময়ের যে কোনো অংশ অন্য অংশের সমরূপ। এর ফলে কোনো পরীক্ষা যখনই সম্পাদন করা হোক তা সময় নির্বাচনের উপর নির্ভর করে না। সময় স্থান নিরপেক্ষ।

নিউটনীয় স্থান কালের ধারণায় আমাদের এই মহাবিশ্ব ত্রিমাত্রিক স্থান ও একমাত্রিক সময় নিয়ে গঠিত। যেখানে সমস্ত ঘটনা ঘটছে ও সমস্ত বস্তু ধারণ করা আছে। অর্থাৎ নিউটনের ধারণা মতে আমাদের এই মহাবিশ্বে স্থানের উপর কালের কোনো প্রভাব নেই, তিনি স্থান ও কালকে পৃথকভাবে বিবেচনা করেছেন। তথা কাল বা সময় ধ্রুবক বলে বিবেচ্য হবে। সময়কে কখনও প্রসারিত বা সংকুচিত করা যাবে না, বরং তা আপন ধারায় বহমান।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে নিউটনীয় স্থান কালের ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এর মূলে রয়েছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব।

আইনস্টাইনের ধারণা:

আইন্সটাইনের মতে 'স্থান' ও 'কাল' আলাদা কোনো স্বত্তা নয়। বরং দুটি মিলে একটি স্বত্তা, আর তা হলো 'স্থান-কাল'। এ দুটি একটি অপরটির সাথে এমনভাবে মিলেমিশে একিভূত হয়ে আছে যে, তাদেরকে কখনই আলাদা করা সম্ভব নয়। তার মতে আমাদের মহাবিশ্ব স্থান-কালের সমন্বয়ে চারমাত্রিক স্থানাঙ্ক (x,y,z,t) ব্যবস্থা যাতে মহাবিশ্বের সব ঘটনা গুলো ঘটছে এবং ভৌতবস্তুগুলো অবস্থান করছে। আইনস্টাইন তার আপেক্ষিক তত্ত্বে বলেন যে, স্থান, কাল ও জড় বা ভর কোনোটাই ধ্রুবক বা পরম কিছু নয় এগুলো সবই আপেক্ষিক। অর্থাৎ গতি বা স্থানভেদে কাল বা সময়কে দীর্ঘায়ীত বা প্রসারিত (মন্থরগতি সম্পন্ন সময়) কিংবা সংকুচিত (দ্রুতগতি সম্পন্ন সময়) করা সম্ভব। এছাড়া এটি তীব্র মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের উপরও নির্ভরশীল, কারণ তীব্র মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র সময়ের গতিকে মন্থর করে দিতে পারে। মূলত স্থান-কালের এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমরা নিউটনের আকর্ষণজনিত মহাকর্ষ তত্ত্বের পরিবর্তে স্থান-কালের বক্রতা সংক্রান্ত মহাকর্ষ তত্ত্ব, ওয়ার্মহোল (আন্তঃমহাজাগতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা) কিংবা মহাকর্ষীয় বিকিরণ (ত্বরিত বস্তু কর্তৃক সৃষ্ট স্থান-কালের আন্দোলনজনিত বিশেষ প্রকারের তরঙ্গ) এর ধারণা পাই।

পদার্থবিদ্যায় স্থান-কালের এই আধুনিক ধারণাটির স্পষ্ট ইংগিত মুসলিমদের ধর্মীয় গ্রন্থ পবিত্র কুরআনুল কারীম এবং হাদীসের বিভিন্ন নুসুস থেকে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরুপ এটি ইসলামের সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ *[স.]* এর পবিত্র জবান নিঃসৃত মিরাজের রজনীর বর্ণনা কিংবা দাজ্জাল ও কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদিস থেকে এবং কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহফের ঘটনা থেকেও বুঝা যায়।

স্থান-কাল (Space-time):

পদার্থবিজ্ঞানে স্থান-কাল বলতে যেকোনো গাণিতিক মডেলকে বোঝায় যা সময় এবং স্থানকে মিলিয়ে স্থান-কাল নিরবিচ্ছিন্ন একটি একক কাঠামো গঠন করে। স্থান-কাল মূলত স্থানের তিনটি (x,y,z) মাত্রার সাথে (t) সময়কে যোগ করে একটি (x,y,z,t) চতুর্মাত্রিক ধারণার জন্ম দেয়। ইউক্লিডীয় স্থান ধারণা অনুযায়ী স্থানকে ত্রিমাত্রিক এবং সময়কে একটি আলাদা মাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু এই দুইয়ের মিলন ঘটানোর মাধ্যমে পদার্থবিজ্ঞানীরা অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক জটিলতা ও সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন। এই চতুর্মাত্রিক নীতি দিয়ে বৃহৎ স্কেলে মহাবিশ্বের গঠন থেকে শুরু করে অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু পর্যন্ত প্রায় সবারই পরিচালনার নীতি ব্যাখ্যা করা যায়।

একটি উদাহরণের সাহায্যে স্থান-কালের অবিচ্ছেদ্যতা বুঝানো যায়— ধরা যাক, একটা জোঁনাকি ঘুটঘুটে আঁধারে উড়ছে। হঠাৎ জ্বলে উঠলো এবং এটা পর মুহূর্তেই নিভে গেল। আর তখন একজন পর্যবেক্ষক দেখলেন তার পায়ের পাতার সাপেক্ষে জোঁনাকির অবস্থান হচ্ছে, X একক ডানে, Y একক সামনে ও Z একক ওপরে। যদি একটু পর পর্যবেক্ষকের নিকট জোঁনাকির অবস্থান জনতে চাওয়া হয়, আর তিনি যদি বলেন এটা তার পায়ের পাতার সাপেক্ষে (X,Y,Z) অবস্থানে আছে। তবে তা সঠিক হবেনা কেননা ততক্ষণে জোঁনাকিটা পূর্বের অবস্থান হতে আরো কিছুদূর উড়ে গিয়ে থাকতে পারে। তাই নিখুঁতভাবে বলতে হলে আমাদের বলতে হবে যে জোঁনাকিটা t সময়ে (x,y,z) অবস্থানে আছে, বা এর স্থানাংক (x,y,z,t)। অর্থাৎ নিখুঁতভাবে কোন বিন্দুকে নির্দিষ্ট করতে স্থানের তিনটা আর সময়ের একটা স্থানাংক অপরিহার্য। তাই সময় হলো মহাবিশ্বের অপরিহার্য চতুর্থ মাত্রা। অর্থাৎ যে বিষয়টা এখন ঘটছে অথবা এখন যেটা যে অবস্থানে আছে কিছু সময় পর সেটা সেখানে নাও ঘটতে পারে অথবা সে অবস্থানে নাও থাকতে পারে। আর আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব দেখায় যে স্থান ও কাল এতটাই আন্তঃসম্পর্কিত যে এরা প্রকৃতিতে বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করে না বরং মিলেমিশে একটি সত্তা হিসেবে থাকে। আর একেই বলে স্থান-কাল।

প্রতিপদার্থ (এন্টি ম্যাটার), তমোপদার্থ (ডার্ক ম্যাটার) এবং তমোশক্তি (ডার্ক এনার্জী)

প্রতিপদার্থ বা এন্টি ম্যাটার:

কোন পরমাণুর ভিতরে ইলেক্ট্রন, প্রোটন যদি তাদের বিপরীত আধান ধারণ করে তাহলে তাদেরকে এন্টি পার্টিকেল বা প্রতিকণা বলে। এরকম এন্টি পার্টিকেল দিয়ে তৈরী পদার্থের নাম এন্টি ম্যাটার বা প্রতি পদার্থ। সাধারণ অবস্থায় ইলেক্ট্রনের আধান বা চার্জ ঋণাত্মক হয়। কিন্তু এন্টি ম্যাটারে এর চার্জ ধনাত্মক হয়। যেমনিভাবে কণা দ্বারা পদার্থ গঠিত হয় ঠিক তেমনিভাবে প্রতিকণা দ্বারা প্রতিপদার্থ গঠিত হয়। উদাহরণস্বরুপ— একটি প্রতি ইলেকট্রন (পজিট্রন) এবং একটি প্রতি প্রোটন মিলিত হয়ে গঠন করে একটি প্রতি হাইড্রোজেন পরমাণু। ঠিক যেমনটা করে একটি ইলকট্রন ও প্রোটন মিলে তৈরি করে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু।

পদার্থবিজ্ঞানের অত্যন্ত আলোচিত একটি বিষয় হলো প্রতি পদার্থ। এটি হলো পদার্থের বিপরীত, যা পদার্থের সংস্পর্শে আসলে প্রচন্ড বিস্ফোরণে উভয়েই ধ্বংস হয়ে শক্তি উৎপন্ন হয়। ইলেক্টন আর পজিট্রন পরস্পরের সংস্পর্শে আসা মাত্রই একে অপরকে ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের সমস্ত ভর শক্তিতে রুপান্তরিত হয়ে যায়। আর এই শক্তির পরিমাণ হচ্ছে, $E = mc^2$। বিগ-ব্যাং থিওরিকে প্রমান করতে প্রতিপদার্থের ভূমিকা ব্যাপক।

প্রতিপদার্থ (Antimatter) এবং পদার্থ (Matter) যেহেতু সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কণা দ্বারা গঠিত, তাই পরস্পরের সংস্পর্শে আসলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যায় এবং Annihilation এর মাধ্যমে বিপুল পরিমান শক্তি উৎপন্ন হয়। যদি সব থেকে বিপদজনক নিউক্লিয়ার অস্ত্রের কথা চিন্তা করা হয়, তাহলে সেগুলো তাদের সম্পূর্ণ ভরের এনার্জির মাত্র ৭% থেকে ১০% এনার্জিকে রিলিজ করে ধ্বংসের কাজে। বাকিটুকু এনার্জি রিলিজ করতে পারেনা বা ওয়েস্ট এনার্জিতে রুপান্তর করে। কিন্তু প্রতিপদার্থ তার সম্পূর্ণ এনার্জির ১০০% এনার্জিই রিলিজ করবে যখন সেটি একটি সাধারণ ম্যাটারের সংস্পর্শে আসবে। আমরা জানি, আমাদের চারপাশের দৃশ্যমান জগৎ যা কিছু নিয়ে তৈরি, তার সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে ইলেক্টন, প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে। ইলেক্ট্রনের প্রতিকণা যেমন পজিট্রন, ঠিক তেমনি প্রোটন এবং নিউট্রনেরও প্রতিকণা রয়েছে, যাদের নাম যথাক্রমে এন্টি-প্রোটন এবং এন্টি-নিউট্রন। বিজ্ঞানীদের কাছে প্রতিপদার্থ এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার অন্যতম কারন হলো এর অকল্পনীয় শক্তি উৎপন্ন করার ক্ষমতা।

এন্টি ম্যাটারের ধারনা তৈরি হওয়ার কারন হচ্ছে পদার্থবিদরা এন্টি ম্যাটারের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন। ১৮৯৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী আর্থার শুস্টার প্রথম এন্টি ম্যাটারের ধারনা দেন এবং এন্টিএটোম বা প্রতি পরমানুর অস্তিত্ব অনুমান করেন। তবে তাঁর অনুমান নির্ভর তত্ত্বের অনেকাংশই পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা পরিমার্জন করেন। ১৯২৮ সালে বিজ্ঞানী পল ডিরাক তাঁর একটি গবেষণাপত্রে এন্টিম্যাটারের আধুনিক তত্ত্বের ব্যখ্যা করেন। তিনি ইলেক্ট্রনের জন্য কোয়ান্টাম মেকানিক্স ব্যবহার করতে গিয়ে সেখানে আইনস্টাইনের থিওরী অব রিলেটিভিটি ব্যবহার করে ১৯৩১ সালে সর্বপ্রথম ইলেক্ট্রনের প্রতিকণার অস্তিত্বের কথা ধারণা করেছিলেন। তিনি ইলেক্ট্রনের এ প্রতিকণার নাম দেন 'পজিট্রন'। এর ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানী শ্রোডিঞ্জারের তরঙ্গ তত্ত্বের আলোকে ইলেক্ট্রনের বিপরীত পদার্থ পজিট্রন তৈরির সম্ভাবনা দেখা যায়। এবং ১৯৩২ সালে বিজ্ঞানী কার্ল ডি এন্ডারসন পজিট্রন আবিষ্কার করেন। পরবর্তিতে আরো কিছু পারমানবিক মূল কণিকা যেমন— এন্টিপ্রোটন, এন্টিনিউট্রন এবং এদের সমন্বয়ে এন্টি নিউক্লিয়াস তৈরি করা হয়। এন্টি নিউক্লিয়াস এবং পজিট্রনের সমন্বয়ে পরমানুর বিপরীত কণিকা এন্টিএটোম বা প্রতি পরমাণু তৈরি করা হয় ১৯৯৫ সালে।

প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে গবেষণাগারে তুলনামূলক বড় আঙ্গিকে (সেই বড় আঙ্গিকের পরিমানও বেশ সামান্য) এন্টিম্যাটার তৈরি করা হয়। এন্টিম্যাটার তৈরির পর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এটাকে টিকিয়ে রাখা। কারন একে যে পাত্রে রাখা হবে সেটা কোন না কোন পদার্থ দ্বারা তৈরি করতে হবে। ফলে সেই পদার্থ প্রতিপদার্থের সাথে মিলে একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। তবে বিজ্ঞানীরা এই সমস্যার সমাধান করেন। তাঁরা বিশেষ স্থিতিশীল চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে তার ভিতরে এন্টিম্যাটার সংরক্ষণ করেন। চৌম্বকক্ষেত্র কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি হয় না। এটা শুধুমাত্র একটি বলক্ষেত্র যেখানে প্রতিপদার্থ আকৃষ্ট হয়ে আটকে যায় এবং কোন পদার্থের সংস্পর্শে না আসতে পারায় সংরক্ষিত থাকে। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা অনেক প্রচেষ্টার পরে এন্টি-হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি করতে পেরেছেন। এটাই এখন পর্যন্ত তৈরি করা সব থেকে জটিল প্রতিকণা।

বিগ-ব্যাং এর ফলে যেমন পদার্থ দিয়ে আমাদের মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, সে রকম ভাবে এন্টিম্যাটার বা প্রতিপদার্থ দিয়ে সৃষ্ট আরেকটা মহাবিশ্ব থাকার বিপুল সম্ভবনা রয়েছে যা দেখতে আমাদের মহাবিশ্বেরই প্রতিরুপ। যেমনটা পদার্থবিদ্যার এখনও সমাধান না হওয়া বিষয়গুলো মধ্য থেকে 'ব্রেন বিশ্বতত্ব' (যেখানে স্ট্রিংতত্ত্বের সাহায্যে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও গঠন বর্ণনা করার চেষ্টা হয়) -এ ধারণা করা হয়। স্ট্রিং তত্বে, একটি ঝিল্লি বা "ব্রেন" হলো একটি বস্তু যা বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান।

উল্লেখ্য ব্রেন বিশ্বতত্বের মধ্যকার কিছু বিশেষ ধারণা হলো— বহু মহাবিশ্ব তত্ব, সমান্তরাল মহাবিশ্ব তত্ব ও চক্রীয় মহাবিশ্ব তত্ব। এ তত্বগুলোর উল্লেখযোগ্য ধারনা মতে, আমাদের মহাবিশ্বই একমাত্র নয়, আরও অকল্পনীয় বিরাট সংখ্যক মহাবিশ্ব থাকা উচিত। এর কোনোটা সম্পূর্ণ অন্যরকম, কোনোটা প্রায় একই, কোনোটায় প্রাণ নেই, কোনোটায় প্রাণ আছে, কোনোটায় আমরা পর্যন্ত থাকবো সামান্য কিছু তফাৎসহ (যেমন হয়ত সেখানে আমাদের সময়ের কোনো শেষ বা মৃত্যু নেই)। এমনকি সম্পূর্ণ একই বা বহু মাত্রাবিশিষ্ট (সমান্তরাল মহাবিশ্ব তত্বানুসারে এগারো মাত্রার) একটি মহাবিশ্ব থাকাও আশ্চর্য নয়! হতে পারে এ মহাবিশ্বগুলো ইসলামের পরিভাষায় রুহের জগত (ইল্লিয়িন ও সিজ্জিন), আখিরাত, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম, আরাফ বা এমন কিছু। আল্লাহ'ই ভালো জানেন।

তমোপদার্থ বা ডার্ক ম্যাটার:

ডার্ক ম্যাটার হচ্ছে সেই ধরনের পদার্থ, যেটা আসলে যে কী ধরনের পদার্থ সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না এবং এখন পর্যন্ত এটাই এর সবচাইতে ভালো সংজ্ঞা! আদতেই এর উৎস, গঠন সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।



ডার্ক ম্যাটার (Dark Matter) বা **অদৃশ্য বস্তু** হলো মহাবিশ্বের এমন এক রহস্যময় পদার্থ যা আমরা সরাসরি দেখতে পাই না, কারণ এটি আলো বা অন্য কোনো তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ শোষণ, প্রতিফলন বা নির্গত করে না। মহাবিশ্বের মোট উপাদানের প্রায় **২৭%** হলো এই ডার্ক ম্যাটার। আমরা চোখ দিয়ে বা টেলিস্কোপ দিয়ে যা কিছু দেখি (গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি), তা মহাবিশ্বের মাত্র ৫%। বাকি অংশটুকুর বড় অংশই হলো ডার্ক ম্যাটার। বিজ্ঞানীরা মূলত **মহাকর্ষীয় প্রভাব (Gravitational Effect)** দেখে এর উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন। এর প্রধান দুটি প্রমাণ হলো—

- **গ্যালাক্সির ঘূর্ণন গতি:** বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, গ্যালাক্সির বাইরের দিকের নক্ষত্রগুলো অনেক বেশি দ্রুত ঘুরছে। সাধারণ দৃশ্যমান পদার্থের ভর দিয়ে এই গতি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সেখানে অবশ্যই এমন কিছু অদৃশ্য পদার্থ আছে যার প্রচণ্ড মহাকর্ষ বল নক্ষত্রগুলোকে ছিটকে যেতে দিচ্ছে না।
- **গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং:** ডার্ক ম্যাটারের বিশাল ভরের কারণে দূরবর্তী নক্ষত্রের আলো যখন এর পাশ দিয়ে আসে, তখন সেই আলো বেঁকে যায় (ঠিক যেমন লেন্সের ভেতর দিয়ে আলোর প্রতিসরণ ঘটে)। এই বাঁকানো আলো পর্যবেক্ষণ করে ডার্ক ম্যাটারের মানচিত্র তৈরি করা হয়।

ডার্ক ম্যাটার কী দিয়ে তৈরী তা এখনও বের করা না গেলেও এইটুকু নিশ্চিত হওয়া গেছে আমাদের পরিচিত কোনকিছুর সাথে এর কোন মিল নেই। ইলেকট্রন প্রোটন বা নিউট্রন নয়, ডার্ক ম্যাটার এমন কিছু দিয়েই তৈরী যা আমরা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারি নি। তবে, কোয়ান্টাম ফিজিক্স 'এক্সিয়ন' নামে এক ধরণের পারমাণবিক কণার কথা বলে, যার বৈশিষ্ট্যের সাথে ডার্ক ম্যাটারের কিছু বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। হতে পারে ডার্ক ম্যাটার এক্সিয়ন দিয়ে তৈরী, আবার নাও হতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন। একটি হাইপোথিসিস অনুযায়ী, ডার্ক ম্যাটার উইম্প (Weak Interacting Massive Particle, WIMP) দিয়ে তৈরী, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা পদার্থের সাথে এতই দুর্বলভাবে মিথস্ক্রিয়া করে যে বিশাল ভরের কোন ডার্ক ম্যাটার আমাদের ভেতর দিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারবে, আমরা টেরই পাব না!

ডার্ক এনার্জি বা তমোশক্তি:

এই ডার্ক এনার্জি কী ধরনের শক্তি তা এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে বেশ কয়েকটা থিওরি দাঁড় করানো হয়েছে। একটি থিওরি অনুযায়ী, ডার্ক এনার্জি হল শুন্য বা ফাঁকা স্থানের একটি বৈশিষ্ট্য যা দুটি বস্তুকে ঠেলে দিয়ে তাদের মধ্যে আরও ফাঁকা জায়গা তৈরী করে। ঠিক মহাকর্ষ বলের বিপরীতটা। আমাদের মহাবিশ্বের প্রায় ৬৮ শতাংশই গঠিত এই ডার্ক এনার্জি দিয়ে। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের ফলে যত বেশি শুন্যস্থান বাড়ছে, তত বেশি বাড়ছে ডার্ক এনার্জি। এবং তত বেশি শক্তি দিয়ে দূরে দূরে ঠেলে দিচ্ছে গ্যালাক্সিগুলোকে। ফলে বাড়ছে সম্প্রসারণের গতি। আরেকটি ধারণা মতে, মহাকাশে একধরনের কণা শুন্য থেকে ক্রমাগত বুদবুদের মত সৃষ্টি হয় আবার বুদবুদের মত মিলিয়ে যায়। এই রহস্যজনক কণাটি থেকে সৃষ্টি হয় ডার্ক এনার্জি। যদিও, এসকল ধারণা কেবলমাত্র ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রহস্য উদ্ধারে পদার্থবিজ্ঞান যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। আল্লাহই তাওফিক দাতা।

কসমিক হরাইজন বা মহাজাগতিক দিগন্ত:

ডার্ক এনার্জির এই ধাক্কাধাক্কি জনিত কর্মকাণ্ডের ফলে মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হতে হতে দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রগুলো একসময় এতটাই দূরে সরে যাবে যে, সেগুলো থেকে প্রতিফলিত আলো পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপেও ধরা পড়বে না। ফলে ছোট হয়ে যাবে 'কসমিক হরাইজন'। কসমিক হরাইজন (Cosmic Horizon) বা মহাজাগতিক দিগন্ত হলো মহাবিশ্বের সেই কাল্পনিক সীমা, যার বাইরের কোনো বস্তু বা ঘটনা থেকে আলো (বা অন্য কোনো সংকেত) এখনও আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। সহজ কথায়, আমরা মহাবিশ্বের যতটুকু অংশ দেখতে পাই, তার শেষ সীমানাই হলো কসমিক হরাইজন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে মূলত দুই ধরনের হরাইজন নিয়ে আলোচনা করা হয়:

- **পার্টিকেল হরাইজন বা কণা দিগন্ত (Particle Horizon):** এটি বর্তমান সময়ের সেই সীমা, যেখান থেকে আলো মহাবিশ্বের জন্মের পর থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে। এটিই আমাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের (Observable Universe) সীমানা। এর ব্যাসার্ধ প্রায় ৪৬.৫ বিলিয়ন আলোকবর্ষ।
- **ইভেন্ট হরাইজন বা ঘটনা দিগন্ত (Event Horizon):** এটি মহাজাগতিক সেই সীমা, যার ওপার থেকে আসা কোনো আলো ভবিষ্যতে কোনোদিনও আমাদের কাছে পৌঁছাবে না।

সারণী: মৌলিক রাশি এবং তাদের একক ও মাত্রা

রাশির নাম	রাশির প্রতীক	রাশির মাত্রা	এস. আই (M.K.S) একক	এস. আই (M.K.S) এককের প্রতীক
দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব বা সরণ বা অবস্থান	s	L	মিটার	m
ভর	m	M	কিলোগ্রাম	kg
সময়	t	T	সেকেন্ড	s
তাপমাত্রা	θ বা T	Θ বা θ	কেলভিন	K
তড়িৎ প্রবাহ	I	I	অ্যাম্পিয়ার	A
দীপন তীব্রতা	I বা I_v	J	ক্যান্ডেলা	cd
পদার্থের পরিমাণ	n	N	মোল	mol

ভৌতজগতে অসংখ্য রাশি থাকলেও উপরোক্ত সাতটি রাশিই মৌলিক। বাকি সকল রাশিই কোনো না কোনো ভাবে মৌলিক রাশির উপর নির্ভরশীল। তাই তাদেরকে লব্ধ বা যৌগিক রাশি বলে। মৌলিক রাশি সমূহের একক ও মাত্রা জানা থাকলে সকল লব্ধ রাশির একক ও মাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব। এই সাতটি মৌলিক রাশির আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সাতটি একককে এস. আই (S.I) একক বলে। S.I এসেছে ফরাসি ভাষার Systeme International d'Unites কথাটি থেকে।

Systeme International d'Unites: ভৌত পরিমাণ পরিমাপের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একক ব্যবস্থাকে Systeme International d'Unites বা SI পদ্ধতি বলে। এটি ১৯৬০ সালে ফ্রান্সে একাদশ তম সাধারণ সম্মেলনে গৃহীত সাতটি মৌলিক এককের সমন্বয়ে, বিশ্বব্যাপী পরিমাপের সমতা বজায় রাখার জন্য স্বীকৃত একক পদ্ধতি।

লব্ধ রাশির গঠন প্রক্রিয়ায় একই পদ্ধতিতে কোনো রাশির একাধিক একক থাকতে পারে, যারা মানের দিক থেকে পরস্পর সমান। যেমন—SI পদ্ধতিতে বলের এককদ্বয় N ও $kg\,ms^{-2}$ হওয়ায় $1\ N = 1\ kg\,ms^{-2}$ । একইভাবে কাজ বা শক্তির তিনটি একক যথাক্রমে J, N m ও $kg\,m^2s^{-2}$ হওয়ার কারণে এদের সম্পর্ক হলো, $1\ J = 1\ N\,m = 1\ kg\,m^2\,s^{-2}$। অনুরূপভাবে ক্ষমতার ক্ষেত্রেও চারটি ভিন্ন একক W, $J\,s^{-1}$, $N\,ms^{-1}$ ও $kg\,m^2s^{-3}$ পরস্পর সমান; অর্থাৎ $1\ W = 1\ J\,s^{-1} = 1\ N\,ms^{-1} = 1\ kg\,m^2\,s^{-3}$। মূলত নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এককগুলো ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হলেও তাদের কার্যকরী মান অভিন্ন থাকে।

বেগ **একটি লব্ধ রাশি কারণ—** যে সকল রাশি মৌলিক রাশির উপর নির্ভর করে তাদেরকে লব্ধ রাশি বলে।
আমরা জানি, বেগ = সরণ / সময়

$\Rightarrow v = s / t$

এখানে বেগ রাশিটি মৌলিক রাশি সমূহ তথা সরণ ও সময়ের উপর নির্ভরশীল; তাই বেগ একটি লব্ধ রাশি।

অনুরূপভাবে, **ত্বরণ একটি লব্ধ রাশি কারণ—** যে সকল রাশি মৌলিক রাশি থেকে পাওয়া যায় তাদেরকে লব্ধ রাশি বলে।
আমরা জানি, ত্বরণ = বেগ / সময়

$\Rightarrow a = v / t$

$\Rightarrow a = (s / t) / t \qquad [\because v = s / t]$

$\Rightarrow a = s / t^2$

এখানে ত্বরণ রাশিটি মৌলিক রাশি সমূহ তথা সরণ ও সময়ের উপর নির্ভরশীল; তাই ত্বরণ একটি লব্ধ রাশি।

পরিমাপের একক:

যে আদর্শ মানের সাথে তুলনা করে ভৌত রাশি সমূহকে পরিমাপ করা হয়, তাদেরকে পরিমাপের একক বলে।

এককের প্রকারভেদ:

একক তিন প্রকার। যথা—

1. মৌলিক একক
2. যৌগিক বা লব্ধ একক
3. ব্যবহারিক একক

মৌলিক একক: যে সকল একক অন্য এককের উপর নির্ভর করে না এবং একেবারে স্বাধীন তাকে মৌলিক একক বলে।
যৌগিক বা লব্ধ একক: যে এককগুলো মৌলিক এককগুলোর গাণিতিক সমন্বয়ে গঠিত হয়, সেগুলোকে লব্ধ একক বলে।
ব্যবহারিক একক: কিছু মৌলিক একক খুব বড় বা খুব ছোট হওয়ায় ব্যবহারিক কাজে তাদের গুণিতক বা উপগুণিতককে একক হিসেবে ব্যবহার করা হয়; এসব একককে ব্যবহারিক একক বলা হয়।

এককের পদ্ধতি:

একক পদ্ধতি হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে নির্দিষ্ট কিছু মৌলিক একক ধরে নিয়ে সব ভৌত রাশির একক নির্ধারণ করা হয়। এককের পদ্ধতি তিনটি। যথা—

1. মেট্রিক পদ্ধতি বা ফ্রেঞ্চ পদ্ধতি বা C.G.S (সেন্টিমিটার-গ্রাম-সেকেন্ড) পদ্ধতি
2. F.P.S (ফুট-পাউন্ড-সেকেন্ড) পদ্ধতি
3. M.K.S (মিটার-কিলোগ্রাম-সেকেন্ড) পদ্ধতি

- **C.G.S** পদ্ধতি: মৌলিক একক হিসেবে সেন্টিমিটার, গ্রাম ও সেকেন্ড ব্যবহৃত হয়।
- **F.P.S** পদ্ধতি: মৌলিক একক হিসেবে ফুট, পাউন্ড ও সেকেন্ড ব্যবহৃত হয়।
- **M.K.S** পদ্ধতি: মৌলিক একক হিসেবে মিটার, কিলোগ্রাম ও সেকেন্ড ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে M.K.S পদ্ধতিটি আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। তাই এ পদ্ধতিকে এস. আই (S.I) পদ্ধতি বলা হয়।

লব্ধ বা যৌগিক রাশির একক নির্ণয়:

বেগের (S.I) একক নির্ণয়—

আমরা জানি, বেগ = সরণ / সময়

$\Rightarrow v = s / t$

$\therefore$ v এর একক = (s এর একক) / (t এর একক)

$\therefore$ v এর একক = m / s

= ms^{-1}

ত্বরণের (S.I) একক নির্ণয়—

আমরা জানি, ত্বরণ = বেগ / সময়

$\Rightarrow a = v / t$

$\Rightarrow a = (s / t) / t$ $\quad [\because v = s / t]$

$\Rightarrow a = s / t^2$

$\therefore$ a এর একক = (s এর একক) / (t এর একক)^2

$\therefore$ ত্বরণের একক = m / s^2

= ms^{-2}

মৌলিক রাশির একক পরিচিতি:

মিটার (m): শূন্য মাধ্যমে এক সেকেন্ডের 299792458 ভাগের এক ভাগ সময়ে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটি হচ্ছে এক মিটার।
কিলোগ্রাম (kg): প্লাঙ্কের ধ্রুবককে 6.62607015×10^{-34} m^2s^{-1} দিয়ে ভাগ করলে যে ভর পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে এক কিলোগ্রাম। এছাড়াও, ফ্রান্সের স্যাভ্রেতে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েটস এন্ড মেজারসে এ রক্ষিত প্লাটিনাম ইরিডিয়াম সংকর ধাতুর তৈরী একটি সিলিন্ডারের ভরকে এক কিলোগ্রাম বলে। এই সিলিন্ডারটির ব্যাস 3.9 cm এবং উচ্চতা 3.9 cm।
সেকেন্ড (s): সিজিয়াম 133 (Cs^{133}) পরমাণুর 9192631770 টি স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে পরিমান সময় নেয় সেটি হচ্ছে এক সেকেন্ড।
অ্যাম্পিয়ার (A): প্রতি সেকেন্ডে 1 / $1.602176634\times10^{-19}$ সংখ্যক ইলেকট্রনের সমপরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হলে সেটি হচ্ছে এক অ্যাম্পিয়ার। অন্যভাবে বলা যায়, শূন্য স্থানে এক মিটার দূরত্বে অবস্থিত অসীম দৈর্ঘ্যের এবং উপেক্ষণীয় বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদের দুটি সমান্তরাল সরল পরিবাহকের প্রত্যেকটিতে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ চললে পরস্পরের মধ্যে প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে 2×10^{-7} নিউটন বল উৎপন্ন হয় তাকে এক অ্যাম্পিয়ার বলে।
কেলভিন (K): যে পরিমাণ তাপমাত্রার পরিবর্তনে তাপশক্তির 1.380649×10^{-23} Joule (জুল) পরিবর্তন হয় সেটি হচ্ছে এক কেলভিন। অন্যভাবে বলা যায়, পানির ত্রৈধ বিন্দুর তাপমাত্রার 1 / 273.16 ভাগকে এক কেলভিন বলে।
মোল (mol): যে পরিমাণ বস্তুতে এভোগাড্রোর ধ্রুব 6.02214076×10^{-23} সংখ্যক কণা থাকে সেটি হচ্ছে এক মোল। অন্যভাবে বলা যায়, যে পরিমাণ পদার্থে 0.012 কিলোগ্রাম কার্বন-১২ এ অবস্থিত পরমাণু সমান সংখ্যক প্রাথমিক ইউনিট (যেমন— পরমাণু, অণু, আয়ন, ইলেকট্রন ইত্যাদি বা এগুলোর নির্দিষ্ট কোনো গ্রুপ) থাকে তাকে এক মোল বলে।
ক্যান্ডেলা (cd): কোনো আলোক উৎস একটি নির্দিষ্ট দিকে 540×10^{12} Hz (হার্টজ) কম্পাঙ্কের একবর্ণী বিকিরণ নিঃসরণ করে এবং তার ঐ নির্দিষ্ট দিকে বিকিরণ তীব্রতা হচ্ছে প্রতি স্টেরেডিয়ান ঘনকোণে 1 / 683 W (ওয়াট)।
অর্থাৎ যে পরিমাণ দীপন তীব্রতার নিম্নোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে, তাকে এক ক্যান্ডেলা বলে। যথা—

1. নির্দিষ্ট দিকে একবর্ণী বিকিরণ নিঃসরণ করবে।
2. প্রতি সেকেন্ডে 540×10^{12} Hz কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট হতে হবে।
3. এবং তার বিকিরণ তীব্রতা প্রতি স্টেরেডিয়ান ঘনকোণে 1 / 683 W হতে হবে।

আলোক ফ্লাক্স ও দীপন তীব্রতা

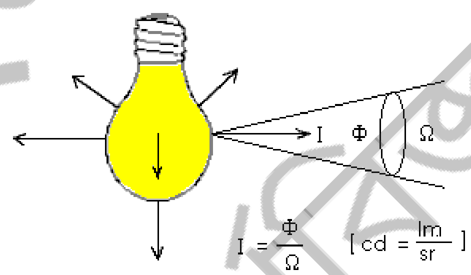
আলোক ফ্লাক্স: আলোক ফ্লাক্স হলো নির্গত শক্তির দিক থেকে একটি আলোক উৎসের উজ্জ্বলতার পরিমাপ। কোন দীপ্তিমান বস্তু থেকে এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ আলোক শক্তি নির্গত হয় তাকে দীপ্তি বা আলোক প্রবাহ বা আলোক ফ্লাক্স বলে। একে ϕ (ফাই) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আলোক ফ্লাক্সের এস. আই একক হচ্ছে lm (লুমেন)।
লুমেন (lm): লুমেন হলো আলোক ফ্লাক্সের এস. আই একক যা দ্বারা কোনো উৎস থেকে আলোর মোট পরিমাণ পরিমাপ করা হয়। এটি একটি আলোক উৎপাদনকারী উৎস থেকে আলো আকারে প্রকাশিত শক্তির পরিমাপ। একটি আলোক উৎস হতে একক দুরে অবস্থিত একটি তলের একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রতি সেকেন্ডে লম্বভাবে যে পরিমান আলো পতিত হয় তাকে এক লুমেন বলে।
দীপন তীব্রতা: কোনো বিন্দু উৎস থেকে প্রতি সেকেন্ডে কোনো দিকে একক ঘনকোণে যে পরিমাণ আলোক শক্তি নির্গত হয় তাকে ঐ উৎসের দীপন তীব্রতা বলে। দীপন তীব্রতা বলতে বোঝায় একটি আলোক উৎস দ্বারা একটি পৃষ্ঠ কি পরিমাণ আলোকিত হবে। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো পৃষ্ঠের এক বর্গমিটার ক্ষেত্রফলে আপতিত আলোক ফ্লাক্সের পরিমাণকে ঐ পৃষ্ঠ বা তলের দীপন তীব্রতা বলে। একে I বা I_v দ্বারা প্রকাশ করা হয়। দীপন তীব্রতার এস. আই একক cd (ক্যান্ডেলা)।

আলোক ফ্লাক্স (ϕ) ও দীপন তীব্রতা (I_v) এর সম্পর্ক:

আলোক ফ্লাক্স = দীপন তীব্রতা × স্টেরেডিয়ান ঘনকোণ।

$\Rightarrow \phi = I_v \times \Omega$

$\Rightarrow I_v = \phi / \Omega$



উপসর্গ বা গুণিতক

পদার্থবিদ্যার ভাষায় আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে অনুমোদিত 10 (দশ) এর নির্ধারিত ঘাতকে বা সূচককে উপসর্গ বলে। অনেক সময় মৌলিক এককগুলোর ভগ্নাংশ বা গুণিতক ব্যবহার করা সুবিধাজনক হয়। যখন একটি রাশির মান খুব বড় বা খুব ছোট হয়, তখন উপসর্গগুলো খুবই প্রয়োজনীয় হয়।

এস. আই ইউনিটে ব্যবহৃত গুণিতক বা উপসর্গ (উপগুণিতক)

10 (দশ) এর ধনাত্মক সূচক		
গুণিতক বা উপসর্গ	**উৎপাদক**	**সংকেত**
এক্সা (exa)	10^{18}	E
পেটা (peta)	10^{15}	P
টেরা (tera)	10^{12}	T
গিগা (giga)	10^{9}	G
মেগা (mega)	10^{6}	M
কিলো (kilo)	10^{3}	k
হেক্টো (hecto)	10^{2}	h
ডেকা (deca)	10^{1}	da
10 (দশ) এর ঋণাত্মক সূচক		
ডেসি (deci)	10^{-1}	d
সেন্টি (centi)	10^{-2}	c
মিলি (milli)	10^{-3}	m
মাইক্রো (micro)	10^{-6}	μ
ন্যানো (nano)	10^{-9}	n
পিকো (pico)	10^{-12}	p
ফেমটো (femto)	10^{-15}	f
এটো (atto)	10^{-18}	a

বৈজ্ঞানিক প্রতীক ও সংকেত

কোনো সংখ্যাকে 10 (দশ) এর যেকোনো ঘাত এবং 1 থেকে 10 এর মধ্যে অপর সংখ্যার গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা হলে তাকে বৈজ্ঞানিক প্রতীক বলে।

যেমন— $6733000000 = 6.733\times10^{9}$

এবং $0.00000846 = 8.46\times10^{-6}$

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বৈজ্ঞানিক প্রতীকে প্রকাশিত সংখ্যাটির 10 (দশ) এর ধনাত্মক সূচক যত, দশমিক বিন্দুকে ডানদিকে ততঘর সরালে আর 10 (দশ) এর ঋণাত্মক সূচক যত দশমিক বিন্দুকে বামদিকে ততঘর সরালে মূল সংখ্যাটি পাওয়া যায়।

এককের সংকেত লেখার নিয়ম:

এককের সংকেত লেখার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়ে থাকে—

- কোনো রাশির মান প্রকাশ করার জন্য একটি সংখ্যা লিখে তারপর একটি ফাঁকা জায়গা (space) রেখে এককের সংকেতটি লিখতে হয়। যেমন— 2.21 kg, 7.3×10^{2} m^{2} কিংবা 22 K, শতকরা চিহ্নও (%) এই নিয়ম মেনে চলে। তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে কোণের একক তথা ডিগ্রি (°), মিনিট (′) বা সেকেন্ড (″)। এগুলো লেখার সময় সংখ্যার পর কোনো ফাঁকা জায়গা (space) রাখতে হয় না।
- গুণনে প্রাপ্ত লব্ধ একক লেখার সময় দুই এককের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা (space) দিতে হয়। যেমন— N m
- ভাগ দ্বারা প্রাপ্ত লব্ধ এককের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক সূচক বা '/' (যেমন— ms^{-1} কিংবা m/s) দিয়ে প্রকাশ করা হয়।
- প্রতীকগুলো যেহেতু গাণিতিক প্রকাশ, কোনো কিছুর সংক্ষিপ্ত রূপ (abbreviations) নয়, তাই তাদের সাথে কোনো যতি চিহ্ন বা full stop (.) ব্যবহৃত হয় না।
- সাধারণত ছাপার ক্ষেত্রে, এককের সংকেত লেখা হয় সোজা (Roman type) অক্ষরে যেমন— মিটারের সংকেত m, সেকেন্ডের সংকেত s ইত্যাদি। তবে রাশির সংকেত বা প্রতীক লেখা হয় বাঁকা (italic) অক্ষরে যেমন— ভরের সংকেত *m*, সরণের সংকেত *s* ইত্যাদি। এই সকল রাশির সংকেত ও একক লেখার সময় আগে পরে যেকোনো ভাষার ফন্ট (font) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- এককের সংকেত ছোট হাতের অক্ষরে লেখা হয় যেমন cm, s, mol ইত্যাদি। তবে যেগুলো কোনো বিজ্ঞানীর নাম থেকে নেয়া হয়েছে সেগুলোর সংকেত লেখার সময় (এক অক্ষর হলে) বড় হাতের অক্ষর বা (একাধিক অক্ষরের ক্ষেত্রে) প্রথম অক্ষর বড় হাতের হবে। যেমন— নিউটনের নামানুসারে N এবং প্যাস্কালের নামানুসারে Pa হবে। তবে পুরো একক লিখলে অবশ্যই ছোট হাতের অক্ষরে হবে যেমন— newton বা pascal।
- এককের উপসর্গ (k, G, M) এককেরই (m, W, Hz) অংশ বিধায় এর সংকেত ফাঁক (space) ছাড়াই যুক্ত হবে যেমন— km, GW, MHz। একাধিক উপসর্গ অনুমোদিত নয় যেমন— μμF হবে না বরং pF হবে।
- কিলো (10^{3}) এর থেকে বড় সকল উপসর্গের সংকেত বড় হাতের অক্ষরে হবে।
- এককের সংকেত কখনো বহুবচন হয় না। যেমন— 25 kgs নয় বরং সর্বক্ষেত্রে 25 kg হবে।
- কোনো সংখ্যা বা কোনো যৌগিক একক কিংবা সংখ্যা ও একক দুই লাইনে লেখা (line-break) পরিহার করা উচিৎ। খুব প্রয়োজন হলে সংখ্যা ও একককে দুই ভাগ করা যেতে পারে।

ভগ্নাংশের বৈশিষ্ট্য

প্রকৃত ভগ্নাংশ সর্বদা 1 (এক) এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর হয়। আর **অপ্রকৃত ভগ্নাংশ** সর্বদা 1 (এক) এর চেয়ে বৃহত্তর হয়।

- প্রকৃত বা অপ্রকৃত ভগ্নাংশের সাথে 10 (দশ) এর ধনাত্মক সূচক গুণ করলে দশমিক বিন্দু ডানে বা পিছনে যায়।
- প্রকৃত বা অপ্রকৃত ভগ্নাংশের সাথে 10 (দশ) এর ঋণাত্মক সূচক গুণ করলে দশমিক বিন্দু বামে বা সামনে আসে।

ভগ্নাংশের বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে সমীকরণকে অসমতায় প্রকাশক পদ্ধতি:

সমীকরণের দুই পক্ষ সমান রাখতে হলে, চলকের মান তার সহগের ব্যস্তানুপাতিক হয়। অর্থাৎ— যে পক্ষে সহগ বৃহত্তর, সেই পক্ষের মান ক্ষুদ্রতর হয়, আর যে পক্ষে সহগ ছোট, সে পক্ষের মান বৃহত্তর হয়।

$aX = bY$ সমীকরণে,

$a > b$ হলে, $X < Y$ হবে, এবং $a < b$ হলে, $X > Y$ হবে। অতএব—

X = (প্রকৃত ভগ্নাংশ) × Y হলে, $X < Y$ হবে।

X = (অপ্রকৃত ভগ্নাংশ) × Y হলে, $X > Y$ হবে।

মাত্রা:

ভৌত রাশিতে উপস্থিত মৌলিক রাশির সূচককে মাত্রা বলে। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় কোনো একটি রাশি এবং তার মৌলিক এককের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে সংকেত ব্যবহার করা হয় তাকে উক্ত রাশির মাত্রা বলে। যেমন— ভরের মাত্রা M, সময়ের মাত্রা T ইত্যাদি। কোনো রাশির মাত্রা বোঝাতে হলে সেটিকে তৃতীয় বন্ধনীর '[ ]' ভেতর স্থাপন করতে হবে।

মাত্রা সমীকরণ:

কোনো ভৌত রাশি যদি একাধিক রাশির উপর নির্ভর করে তবে দুই পাশের রাশিগুলোর মান না লিখে কেবলমাত্র মাত্রা লিখলে যে সমীকরণ পাওয়া যায় তাকে রাশিগুলোর মাত্রা সমীকরণ বলে। অথবা যে সমীকরণ দ্বারা মাত্রা প্রকাশ করা হয় তাকে মাত্রা সমীকরণ বলে।

লব্ধ বা যৌগিক রাশির মাত্রা নির্ণয়:

বেগের মাত্রা নির্ণয়—

আমরা জানি, বেগ = সরণ / সময়

$\Rightarrow v = s/t$

$\therefore$ v এর মাত্রা = (s এর মাত্রা) / (t এর মাত্রা)

$\therefore [v] = L/T$

$= LT^{-1}$

ত্বরণের মাত্রা নির্ণয়—

আমরা জানি, ত্বরণ = বেগ / সময়

$\Rightarrow a = v/t$

$\Rightarrow a = (s/t)/t$ $\quad [\because v = s/t]$

$\Rightarrow a = s/t^2$

$\therefore$ a এর মাত্রা = (s এর মাত্রা) / (t এর মাত্রা)^2

$\therefore [a] = L/T^2$

$= LT^{-2}$

মাত্রার সাহায্যে সমীকরণের সত্যতা যাচাই:

আমরা জানি কেবলমাত্র একই জাতীয় রাশির যোগ, বিয়োগ বা সমতা সম্ভব। সুতরাং একটি সমীকরণের উভয়পক্ষের প্রতিটি পদ অবশ্যই একই জাতীয় রাশিকে নির্দেশ করতে হবে। অর্থাৎ উভয়পক্ষের প্রতিটি পদের মাত্রা একই হলে সমীকরণটি সিদ্ধ হবে। এক্ষেত্রে ধ্রুব রাশি তথা ধ্রুবক সংখ্যা বিবেচ্য নয়।

মাত্রার সাহায্যে $s = ½ (u + v)\, t$ সমীকরণটির সত্যতা যাচাই করা হলো—

L.H.S = s

$\Rightarrow [s] = L$

এখন,

$u = s/t$

$\Rightarrow [u] = L/T$

$= LT^{-1}$

আবার,

$v = s/t$

$\Rightarrow [v] = L/T$

$= LT^{-1}$

R.H.S = $½ (u + v)\, t$

$\Rightarrow [½ (u + v)\, t] = ½ (LT^{-1} + LT^{-1})\, T$

$= ½ \times 2\, (LT^{-1} . T)$

$= L$

$\therefore$ L.H.S = R.H.S

সুতরাং সমীকরণটি সিদ্ধ।

মাত্রার সাহায্যে $s = ut + ½ at^2$ সমীকরণটির সত্যতা যাচাই করা হলো—

সমীকরণটির বামপক্ষের পদ = s

$\Rightarrow [s] = L$

সমীকরণটির ডানপক্ষের ১ম পদ = ut

$\Rightarrow ut = (s/t)\, t$ $\quad [\because u = s/t]$

$\Rightarrow ut = s$

$\Rightarrow [ut] = L$

সমীকরণটির ডানপক্ষের ২য় পদ = at^2

$\Rightarrow at^2 = (s / t^2)\, t^2$ $\quad [\because a = s / t^2]$

$\Rightarrow at^2 = s$

$\Rightarrow [at^2] = L$

যেহেতু উপরোক্ত সমীকরণের প্রতিটি পদের মাত্রা একই (L)। সুতরাং সমীকরণটির সত্যতা প্রমাণিত হলো।

পরিমাপের যন্ত্রপাতি

ভার্নিয়ার স্কেল (vernier scale)

সংজ্ঞা: মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের ভগ্নাংশের নির্ভুল পরিমাপের জন্য মূল স্কেলের পাশে যে ছোট আরেকটি স্কেল ব্যবহার করা হয় তার নাম ভার্নিয়ার স্কেল। গণিতবিদ পিয়েরে ভার্নিয়ারের নামানুসারে তার আবিষ্কৃত এই স্কেলের নাম ভার্নিয়ার স্কেল।

স্লাইড ক্যালিপার্স (Slide calipers)

সংজ্ঞা: যে যন্ত্রের সাহায্যে ভার্নিয়ার পদ্ধতি দ্বারা কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, ফাঁপা নলের অন্তঃব্যাস, বহির্ব্যাস ও আয়তন সূক্ষ্ম ভাবে পরিমাপ করা হয় তাকে স্লাইড ক্যালিপার্স বলে। এই যন্ত্রের দুটি অংশ থাকে - একটি প্রধান স্কেল অপরটি ভার্নিয়ার স্কেল। ভার্নিয়ার স্কেলটি প্রধান স্কেলের গা ঘেঁষে চলাচল করতে পারে বলে এই যন্ত্রের অপর নাম ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স।

ভার্নিয়ার স্কেল বা স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে কোনো দন্ডের দৈর্ঘ্য পরিমাপ— কোনো দন্ডের দৈর্ঘ্য L হলে—

$$L = M + V \times VC$$

এখানে— M হচ্ছে প্রধান স্কেলের পাঠ।

V হচ্ছে ভার্নিয়ার সমপাতন।

VC হচ্ছে ভার্নিয়ার ধ্রুবক (Vernier Constant)।

ভার্নিয়ার সমপাতন: ভার্নিয়ার স্কেলের যে দাগটি প্রধান স্কেলের দাগের সাথে মিলে যায় কিংবা সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকে, তাকে ভার্নিয়ার সমপাতন বলে। একে V দ্বারা প্রকাশ করা হয়। দাগ নম্বর হওয়ায় ভার্নিয়ার সমপাতনের কোনো একক নেই।

ভার্নিয়ার ধ্রুবক: প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের চেয়ে ভার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগের পার্থক্যকে ভার্নিয়ার ধ্রুবক বলে। একে VC দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সাধারণত, ভার্নিয়ার স্কেলের n ভাগ মূল স্কেলের (n - 1) ভাগের সমান হয়।

সংজ্ঞানুসারে— ভার্নিয়ার ধ্রুবক = প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘর – ভার্নিয়ার স্কেলের এক ঘর।

ভাগসংখ্যা থেকে ভার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ণয়ের পদ্ধতি:

১ম পদ্ধতি: প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘরের মান ও ভার্নিয়ার ভাগ সংখ্যা যখন বিদ্যমান, সেক্ষেত্রে—

$$VC = s / n$$

এখানে— s হচ্ছে প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘরের মান; যা সাধারণত 1 mm হয়।

n হচ্ছে ভার্নিয়ার ভাগসংখ্যা।

২য় পদ্ধতি: ভার্নিয়ার স্কেলের কয়েকটি ঘর সংখ্যা প্রধান স্কেলের কয়েকটি ঘরের সাথে মিলে যাওয়ার ক্ষেত্রে—

$$VC = \frac{x - y}{x} \times s$$

এখানে— X হচ্ছে ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগসংখ্যা।

Y হচ্ছে প্রধান স্কেলের ভাগসংখ্যা।

s হচ্ছে প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘরের মান।

ভার্নিয়ার ধ্রুবক, $VC = \{(X - Y) / X\} \times s$ সমীকরণটির প্রতিপাদন— মনে করি, ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম X ঘর প্রধান স্কেলের Y ঘরের সমান।

আমরা জানি, প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ঘরের দৈর্ঘ্য = s

$\therefore$ প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম Y ঘরের দৈর্ঘ্য = sY

আবার, ভার্নিয়ার স্কেলের X ঘরের দৈর্ঘ্য প্রধান স্কেলের sY ঘরের সমান।

$\therefore$ ভার্নিয়ার স্কেলের X ঘরের দৈর্ঘ্য = sY mm

$\Rightarrow$ ভার্নিয়ার স্কেলের 1 ঘরের দৈর্ঘ্য = sY / X mm

এখন সংজ্ঞানুসারে, ভার্নিয়ার ধ্রুবক = প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘর – ভার্নিয়ার স্কেলের এক ঘর।

$\Rightarrow VC = s - (sY / X)$

$\therefore VC = \{(X - Y) / X\} \times s$

ভার্নিয়ার ধ্রুবক থেকে ভাগসংখ্যা নির্ণয়ের পদ্ধতি:

মনে করি, ব্যবহৃত স্লাইড ক্যালিপার্সের ভার্নিয়ার ধ্রুবক = 0.05 mm

১ম পদ্ধতি: ভার্নিয়ার ধ্রুবক VC হলে, আমরা জানি—

$VC = s / n$

$\Rightarrow n = s / VC$

$\Rightarrow n = 1 / 0.05$ [$\because s = 1$ mm ও $VC = 0.05$ mm]

$\therefore$ n = 20 টি

অর্থাৎ ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগসংখ্যা 20 টি।

আবার ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম X ঘর প্রধান স্কেলের Y ঘরের সমান হলে, আমরা পাই—

$VC = \{(X - Y) / X\} \times s$

$\Rightarrow VC = (X - Y) / X$ [$\because s = 1$ mm]

$\Rightarrow VC \,.\, X = X - Y$

$\Rightarrow Y = X - VC \,.\, X$

$\Rightarrow Y = X\,(1 - VC)$

$\Rightarrow Y = 20\,(1 - 0.05)$ [$\because X = n = 20$ টি ও $VC = 0.05$ mm]

$\therefore Y = 19$ টি

অর্থাৎ ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগসংখ্যা 20 টি।

অতএব, ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ভাগ প্রধান স্কেলের 19 ভাগের সমান।

২য় পদ্ধতি: দেয়া আছে, ভার্নিয়ার ধ্রুবক, $VC = 0.05$ mm

প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য, $s = 1$ mm

ভার্নিয়ার ভাগ সংখ্যা, $n = ?$

আমরা জানি, $VC = s / n$

$\Rightarrow n = s / VC$

$\Rightarrow n = 1$ mm / 0.05 mm

$\Rightarrow n = 20$ টি

সুতরাং ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের দৈর্ঘ্য = $s - VC$

= (1 – 0.05) mm

= 0.95 mm

$\therefore$ ভার্নিয়ার স্কেলের ক্ষুদ্রতম 20 ভাগের দৈর্ঘ্য = (0.95 × 20) mm

= 19 mm

$\therefore$ প্রধান স্কেলের ভাগসংখ্যা = 19 mm / 1 mm [$\because s = 1$ mm]

= 19 টি

অতএব, ভার্নিয়ার স্কেলের 20 ভাগ প্রধান স্কেলের 19 ভাগের সমান।

স্ক্রুগজ (Screw Gauge)

সংজ্ঞা: যে যন্ত্রের সাহায্যে তারের ব্যাসার্ধ, সরু চোঙের ব্যাসার্ধ এবং ছোট দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায় তাকে স্ক্রু গজ বলে।

পিচ (Pitch): স্ক্রুগজের টুপি একবার ঘুরালে রৈখিক স্কেল বরাবর যতটুকু সরণ ঘটে তার পরিমাণ কে পিচ বলে।

লঘিষ্ঠ গণণ (Lest Count): স্ক্রুগজের বৃত্তাকার স্কেলের মাত্র এক ভাগ ঘুরালে এর প্রান্ত যতটুকু সরে আসে তাকে যন্ত্রের লঘিষ্ঠ গণণ বলে। একে LC দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

স্ক্রুগজের ন্যূনাঙ্ক: স্ক্রুগজের রৈখিক স্কেলের এক ঘরের মান সাধারণত 1 mm থাকে এবং বৃত্তাকার স্কেলের 100 টি ভাগসংখ্যা থাকে। এক্ষেত্রে রৈখিক স্কেলের এক ঘরের মানকে বৃত্তাকার স্কেলের ভাগসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যন্ত্রটির লঘিষ্ঠ গণণ পাওয়া যায়। এ যন্ত্রটি সাধারনত তার লঘিষ্ঠ গণণের চেয়ে ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে অক্ষম। একে যন্ত্রটি তথা স্ক্রু-গজের নুন্যাঙ্ক বলে। অর্থাৎ স্ক্রুগজ ন্যূনতম যে দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারে তাকে স্ক্রু-গজের নুন্যাঙ্ক বলে।

স্ক্রুগজের সাহায্যে কোনো দন্ডের ব্যাস বা পুরত্ব পরিমাপ— কোনো দন্ডের ব্যাস বা পুরত্ব D হলে—

$$D = L + C \times LC$$

এখানে— L হচ্ছে রৈখিক স্কেলের পাঠ।

C হচ্ছে বৃত্তাকার স্কেলের যে দাগটি রৈখিক স্কেলের দাগের সাথে মিলে যায় কিংবা অধিকতর নিকটবর্তী থাকে তার পাঠ।

LC হচ্ছে লঘিষ্ট গণন (Lest Count)।

লঘিষ্ঠ গণন নির্ণয়ের পদ্ধতি:

কোনো স্ক্রু গজের লঘিষ্ঠ গণন *LC* হলে,

$$LC = p / n$$

এখানে— *p* হচ্ছে স্ক্রুগজের পিচ; যা সাধারণত 1 mm হয়।
n হচ্ছে বৃত্তাকার স্কেলের ভাগসংখ্যা; যা সাধারণত 100 টি হয়।

পরিমাপের ত্রুটি ও নির্ভুলতা

পরিমাপের সময় বিভিন্ন কারণে পরিমাপে ত্রটি দেখা দিতে পারে। ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির এবং পরীক্ষকদের দক্ষতার উপর পরিমাপের নির্ভুলতা নির্ভর করে অর্থাৎ পরিমাপে ত্রুটি কম হতে পারে। ধরা যাক, একটি মিটার স্কেল নেয়া হলো। স্কেলটিতে সেন্টিমিটার ও মিলিমিটারে দাগ কাটা আছে। এই মিটার স্কেলটির সাহায্যে একটি বইয়ের দৈর্ঘ্য মাপা হলে পরিমাপটি নির্ভুল ধরে নেয়া যেতে পারে। আবার এই স্কেলের সাহায্যে যদি কোনো ঘরের দৈর্ঘ্য মাপা হয় তাহলে ত্রুটির পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। কারণ এই ক্ষেত্রে স্কেলটি পরপর কয়েকবার বসিয়ে দৈর্ঘ্য মাপতে হবে। পরিমাপে নির্ভুলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সব পরীক্ষকের পরীক্ষার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যেমন, একটি তারের দৈর্ঘ্য যদি হয় 20 cm তাহলে তারের দৈর্ঘ্য 20 cm ± 0.1 cm লেখা যেতে পারে। এখানে ± দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারের প্রকৃত দৈর্ঘ্য 19.9 cm এবং 20.1 cm এর মধ্যে হবে। সুতরাং 0.1 cm হলো পরিমাপের অনিশ্চয়তা বা ত্রুটি।

ত্রুটি: পরিমাপকৃত ফলাফলের অনিশ্চয়তাকে পরিমাপের ত্রুটি বলে। পরিমাপে বিভিন্ন ধরণের ত্রুটি থাকতে পারে। নিচে কয়েক ধরণের ত্রুটি উল্লেখ করা হলো—
শূন্য ত্রুটি: যেসব যন্ত্রে ভার্নিয়ার স্কেল বা বৃত্তাকার স্কেল যুক্ত থাকে, সে সকল যন্ত্রের চোয়াল পরস্পরের সাথে মিলিত থাকা অবস্থায় ভার্নিয়ার বা বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মিলে না গেলে তাকে শুন্য ত্রুটি বলে।
শুন্য ত্রুটি দুই প্রকার:
1. ঋণাত্মক শুন্য ত্রুটি বা ঋণাত্মক ত্রুটি
2. ধনাত্মক শুন্য ত্রুটি বা ধনাত্মক ত্রুটি

ঋণাত্মক শুন্য ত্রুটি বা ঋণাত্মক ত্রুটি: স্লাইড ক্যালিপার্স বা স্ক্রু-গজের চোয়াল দুটি একত্রে মিলালে যদি ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের বামদিকে বা আগে থাকে তাহলে এ ত্রুটিকে ঋণাত্মক শুন্য ত্রুটি বা ঋণাত্মক ত্রুটি বলে।
ধনাত্মক শুন্য ত্রুটি বা ধনাত্মক ত্রুটি: স্লাইড ক্যালিপার্স বা স্ক্রু-গজের চোয়াল দুটি একত্রে মিলালে যদি ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের ডানদিকে বা পরে থাকে তাহলে এ ত্রুটিকে ধনাত্মক শুন্য ত্রুটি বা ধনাত্মক ত্রুটি বলে।
ত্রুটিপূর্ণ স্লাইড ক্যালিপার্স বা স্ক্রুগজের পাঠ L ও D হলে—

$$L = M + V \times VC \pm e \qquad D = L + C \times LC \pm e$$

এখানে— e হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ ভার্নিয়ার স্কেল যুক্ত যন্ত্রের ত্রুটির পরিমাণ।
[উপরোক্ত সমীকরণদ্বয়ে ঋণাত্বক শুন্য ত্রুটির ক্ষেত্রে e ঋনাত্মক এবং ধনাত্মক শুন্য ত্রুটির ক্ষেত্রে e ধনাত্মক হবে]

ব্যাকল্যাশ ত্রুটি বা পিছট ত্রুটি: যে সব যন্ত্র সাধারণত স্ক্রু-নাট ইত্যাদি নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরী, সেসব যন্ত্রেই কম বেশি এধরণের ত্রুটি দেখা দেয়। নতুন যন্ত্রে এ ত্রুটি প্রায় থাকেই না। কিন্তু ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে স্ক্রু ক্ষয় হলে আলগা হয়ে পড়ে ফলে স্ক্রু কে উভয় দিকে একই পরিমাণ ঘূর্ণনে সরণ সমান হয় না। একে ব্যাকল্যাশ ত্রুটি বা পিছট ত্রুটি বলে। পাঠ নেয়ার সময় স্ক্রু কে একই দিকে ঘুরিয়ে এ ত্রুটি পরিহার করা যায়।
এলোমেলো ত্রুটি: যখন কোনো রাশি একাধিকবার পরিমাপ করা হয় তখন প্রাপ্ত মান কখনো প্রকৃত মান থেকে কম আবার কখনো বেশি হতে পারে। এমনকি এই কম-বেশির পরিমাণও বিভিন্ন হতে পারে। পরিমাপের এ ধরণের ত্রুটিকে এলোমেলো ত্রুটি বলে।
নিয়মিত ত্রুটি: পরীক্ষাকারে কোনো কোনো ত্রুটির ফলে পরীক্ষাধীন রাশির পরীক্ষালব্ধ মান সর্বদাই এবং নিয়মিতভাবে রাশির প্রকৃত মান অপেক্ষা কম বা বেশি হতে পারে। এ ত্রুটিকে নিয়মিত ত্রুটি বলে।
অনিয়মিত ত্রুটি: ত্রুটির বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কোনো একটি রাশির পাঠ বারবার ভিন্ন হতে দেখা যায়। এ ধরণের ত্রুটিকে অনিয়মিত ত্রুটি বলে।
পুনরাবৃত্তিক ত্রুটি: কোনো রাশি পরিমাপের সময় যদি ত্রুটি সর্বদা একদিকে হয় অর্থাৎ ধনাত্বক হলে শুধু ধনাত্বক কিংবা ঋণাত্বক হলে শুধু ঋণাত্বক হয় তবে এ ধরণের ত্রুটি কে পুনরাবৃত্তিক ত্রুটি বলে।
লেভেল ত্রুটি: নিক্তি, বিক্ষেপ চৌম্বক মান যন্ত্র ইত্যাদি আনুভূমিক বরাবর না থাকলে পাঠ ভুল হয়। এ ধরণের ত্রুটিকে লেভেল ত্রুটি বলে। এসব যন্ত্রের নিচে লেভেলিং স্ক্রু থাকে। স্পিরিট লেভেল বা ওলন সুতা ব্যবহার করে লেভেলিং স্ক্রুর সাহায্যে যন্ত্রকে লেভেল করা হয়।
প্যারালাক্স ত্রুটি বা লম্বন ত্রুটি: আমরা যখন স্কেলের পাঠ নিই, তখন অনেক সময় আমাদের চোখ স্কেলের পাঠ বিন্দুর সঙ্গে লম্ব ভাবে না থেকে স্কেল বরাবর তির্যক অবস্থায় থাকে। এতে দৈর্ঘ্যের সঠিক পাঠ পাওয়া যায় না। এ ধরণের ত্রুটিকে প্যারালাক্স ত্রুটি বা লম্বন ত্রুটি বলে।

ত্রুটির প্রকারভেদ

পরিমাপের সময় অনেক ধরণের ত্রুটি দেখা গেলেও সকল ত্রুটিকে মোটাদাগে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

1. **দৈব ত্রুটি**
2. **ব্যক্তিগত ত্রুটি**
3. **যান্ত্রিক ত্রুটি**

দৈব ত্রুটি: কোন একটি ধ্রুব রাশি কয়েক বার পরিমাপ করলে যে ত্রুটির কারনে পরিমাপকৃত মানে অসামঞ্জস্য দেখা যায় তাকে দৈব ত্রুটি বলে।
ব্যক্তিগত ত্রুটি: পরীক্ষণের সময় পর্যবেক্ষকের নিজের কারণে পাঠে যে ত্রুটি আসে তাকে ব্যক্তিগত ত্রুটি বলে।
যান্ত্রিক ত্রুটি: পরিমাপের যন্ত্রের মধ্যে যে ত্রুটি থাকে তাকে যান্ত্রিক ত্রুটি বলে। ভার্নিয়ার স্কেল যুক্ত যন্ত্রের ত্রুটিকে শুন্য ত্রুটি বলা হয়।

ত্রুটি বা নির্ভুলতার পরিমাপের ক্ষেত্রে আমরা ত্রুটির দুটি রাশি দেখতে পাই-

1. **চূড়ান্ত ত্রুটি বা পরম ত্রুটি**
2. **আপেক্ষিক ত্রুটি বা আনুপাতিক ত্রুটি**

চূড়ান্ত ত্রুটি বা পরম ত্রুটি: কোনো একটি রাশির প্রকৃত মান ও পরিমাপকৃত মানের পার্থক্যকে চূড়ান্ত ত্রুটি বা পরম ত্রুটি বলে। পরিমাপের ক্ষেত্রে ত্রুটির সর্বোচ্চ মানকে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ কোনো রাশি পরিমাপ করার সময় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ত্রুটিকে চূড়ান্ত বা পরম ত্রুটি বলে।
সুতরাং— চূড়ান্ত ত্রুটি = প্রকৃত মান ~ পরিমাপকৃত মান
অর্থাৎ— প্রকৃত মান > পরিমাপকৃত মান হলে,
চূড়ান্ত ত্রুটি = প্রকৃত মান − পরিমাপকৃত মান
আবার, প্রকৃত মান < পরিমাপকৃত মান হলে,
চূড়ান্ত ত্রুটি = পরিমাপকৃত মান − প্রকৃত মান

Note-1: এক মাত্রার পরিমাপে, চূড়ান্ত বা পরম ত্রুটিকেই গড় চূড়ান্ত বা পরম ত্রুটি ধরে নেয়া হয়।
Note-2: যদি কোনো গাণিতিক সমস্যায় শুধু পরিমাপকৃত মান গুলো উল্লেখ করা হয় এবং আপেক্ষিক ত্রুটি নির্ণয় করতে বলা হয় তবে সর্বোচ্চ ত্রুটি ±0.5 ধরে আপেক্ষিক ত্রুটি নির্ণয় করা হয়।

আপেক্ষিক ত্রুটি বা আনুপাতিক ত্রুটি: কোনো একটি রাশির চূড়ান্ত ত্রুটি এবং প্রকৃত মান এর অনুপাতকে আপেক্ষিক ত্রুটি বা আনুপাতিক ত্রুটি বলে। অর্থাৎ—

$$\text{আপেক্ষিক ত্রুটি} = \frac{\text{চূড়ান্ত ত্রুটি}}{\text{প্রকৃত মান}}$$

একে শতকরা হিসাবেও প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ—

$$\text{আপেক্ষিক ত্রুটি} = \frac{\text{চূড়ান্ত ত্রুটি}}{\text{প্রকৃত মান}} \times ১০০\%$$

Note-3: কোন রাশির আপেক্ষিক ত্রুটি ঐ রাশিতে উপস্থিত রাশিসমূহের আপেক্ষিক ত্রুটির সাথে তার নিজস্ব ঘাতের পরমমানের গুণফলের সমষ্টির সমান। এই নিয়মে ঘাত বাড়তে থাকলে আপেক্ষিক ত্রুটি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সঠিক ফলাফলের বিচ্যুতি ঘটে। এক বা দুই ঘাতের ক্ষেত্রে এই নিয়মে আপেক্ষিক ত্রুটি সঠিক হলেও তিন বা ততোধিক ঘাতের ক্ষেত্রে সঠিক ফলাফল পাওয়া যায় না।

ত্রুটি হিসাবের মৌলিক পদ্ধতি:

১ম পদ্ধতি: যখন আপেক্ষিক ত্রুটির মান নির্দিষ্ট এককে উল্লেখ থাকে—
প্রশ্ন: একটি বর্গাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে 7 m পাওয়া গেলো। পরিমাপে ± 0.1 cm ত্রুটি থাকলে, বস্তুটির ক্ষেত্রফলে আপেক্ষিক ত্রুটি কত শতাংশ— তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষন করো।
২য় পদ্ধতি: যখন আপেক্ষিক ত্রুটির মান শতাংশে উল্লেখ থাকে—
প্রশ্ন: একটি বর্গাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে 7 m পাওয়া গেলো। পরিমাপে 5% ত্রুটি থাকলে, বস্তুটির ক্ষেত্রফলে আপেক্ষিক ত্রুটি কত শতাংশ— তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষন করো।
৩য় পদ্ধতি: যখন আপেক্ষিক ত্রুটির মান এবং পরিমাপের স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের উল্লেখ না থাকে—
প্রশ্ন: একটি বর্গাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে 7 m পাওয়া গেলে এর ক্ষেত্রফলে আপেক্ষিক ত্রুটি কত শতাংশ— তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষন করো।
৪র্থ পদ্ধতি: যখন আপেক্ষিক ত্রুটির মান উল্লেখ থাকে না কিন্তু পরিমাপের স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের উল্লেখ থাকে—
প্রশ্ন: একটি বর্গাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে 7 m পাওয়া গেলো। যে স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়েছে সেখানে ক্ষুদ্রতম ভাগ cm এককে থাকলে, বস্তুটির ক্ষেত্রফলে আপেক্ষিক ত্রুটি কত শতাংশ— তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষন করো।

গ্রীক বর্ণমালা

পদার্থবিজ্ঞানে বহুল ব্যবহৃত গ্রীক ভাষার মোট ২৪ টি বর্ণমালার পরিচিতি

বড় হাতের অক্ষর	অক্ষরের নাম	ছোট হাতের অক্ষর
Α	আলফা	α
Β	বিটা	β
Γ	গামা	γ
Δ	ডেল্টা	δ
Ε	এপসাইলন	ε
Ζ	জেটা	ζ
Η	ইটা	η
Θ	থিটা	θ
Ι	আইওটা	ι
Κ	কাপ্পা	κ
Λ	ল্যামডা	λ
Μ	মিউ	μ
Ν	নিউ	ν
Ξ	সি	ξ
Ο	ওমিক্রন	ο
Π	পাই	π
Ρ	রো	ρ
Σ	সিগমা	σ ς
Τ	টাউ	τ
Υ	ইপসাইলন	υ
Φ	ফাই	φ
Χ	কাই	χ
Ψ	সাই	ψ
Ω	ওমেগা	ω